দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

কালোটাকার পঙ্কে
ডুবে থাকা ভারত
চান নাকি বিরোধীরা ?
চক্র —পৃঃ ১২

দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে
রোহিঙ্গারা বিপজ্জনক
— পৃঃ ১৬

৭০ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা।। ২০ নভেম্বর ২০১৭।। ৩ অগ্রাহয়ণ - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

ডেঙ্গু-মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি

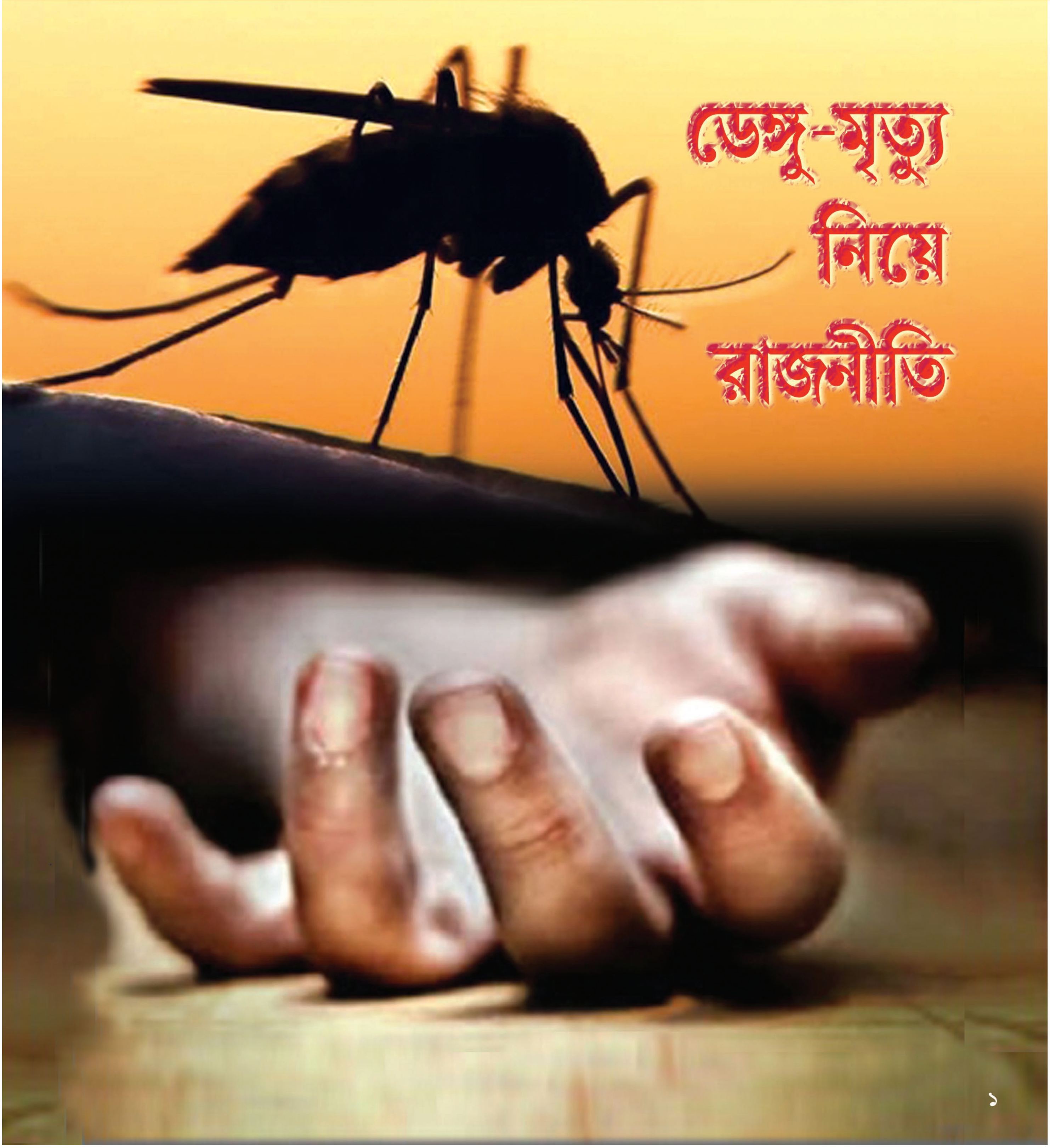

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ১৩ সংখ্যা, ৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

২০ নভেম্বর - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ / ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

খোলা চিঠি : মুকুল রায় পথ দেখিয়েছেন, বাকিরা পথ খুঁজছেন □ সুন্দর মৌলিক □ ১০

রোহিঙ্গাদের ভারতে আশ্রয় না দিয়ে মোদী সরকার সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে □ গূঢ়পুরুষ □ ১১

কালোটাকার পঙ্কে ডুবে থাকা ভারত চান নাকি বিরোধীরা? □ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ১২

চীনের জলসীমা ঘিরে ভারতের চক্রব্যূহ □ সাধন কুমার পাল □ ১৪

দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে রোহিঙ্গারা বিপজ্জনক □ ধর্মানন্দ দেব □ ২৬

ডেঙ্গু রাজনীতি □ ১৯

ডেঙ্গু নিয়ে রাজনীতি, বলি হচ্ছেন সাধারণ মানুষ □ পার্থ চৌধুরী □ ২০

ডেঙ্গুতে মৃত্যুর মিছিল— দায় কার? □ ডা: সুভাষ সরকার □ ২২

ডেঙ্গু নিয়ে রাজ্য সরকারের ওপর আস্থা না রেখে নিজেদেরই ব্যবস্থা নিতে হবে □ ডা: ইন্দ্রনীল খাঁ □ ২৩

গরিবকে বন্দি করে রাখার কাচের ঘর ভেঙে দিচ্ছে মোদী সরকার □ এম জে আকবর □ ২৭

সমন্বয়ের প্রতীক কার্তিক □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত □ সলিল গেঁউলি □ ৩৩

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গান্ধীজী □ বিমলেন্দু ঘোষ □ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এইসময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ □ **চিঠিপত্র : ২৯-৩০** □ **অঙ্গনা : ৩৪** □ **সুস্বাস্থ্য: ৩৬** □ **অন্যরকম : ৩৭** □ **খেলা : ৩৮** □ **স্বজন-বিয়োগ : ৩৯** □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

নোট বাতিলের বর্ষপূর্তি

কেন্দ্রের নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ হবে— কথাটা বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁকে এবং দেশের কতিপয় বিরোধী রাজনীতিবিদকে চূড়ান্ত হাস্যাস্পদ করে সিদ্ধান্তটি প্রমাণ করেছে ভারতের কালো অর্থনীতির কলি ফেরাতে তার প্রয়োজন ছিল। এও বোঝা গেছে, কালো অর্থনীতির সুযোগ নিয়ে যাঁরা কালোটাকার পাহাড় বানিয়ে রেখেছিলেন, তাঁরাই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব। সাধারণ মানুষ নন। সম্প্রতি নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের বর্ষপূর্তি হয়ে গেল। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব নিয়ে থাকবে তিনটি ক্ষুরধার বিশ্লেষণ। লিখবেন কুণাল চট্টোপাধ্যায়, শেখর সেনগুপ্ত এবং সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

হকার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ স্বস্তিকার জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টটি লেন
কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন ঃ
(০৩৩) ৪০৬৪৪১০৩
৪০৬৪৪০৯৭

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিরোধীদের আর্তনাদ

দুর্নীতি ও ক্রনি কোরাপশনের জনক কংগ্রেস দল, তাহাদের দোসর বামদল এবং কংগ্রেসের উপজাত তৃণমূল দলের আর্তনাদ দেশবাসী প্রত্যক্ষ করিল গত ৮ নভেম্বর। এই দিনটিকে তাহারা কালাদিবস হিসাবে পালন করিল। কেননা গত বৎসর এই দিনটিতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশ হইতে কালোটাকা ও দুর্নীতির মূলোৎপাটন করিতে অর্থনৈতিক সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করিয়াছিলেন। দেশবাসী তখন প্রধানমন্ত্রীর পাশে দাঁড়াইয়াছিল। হতাশ কংগ্রেস ও তাহার দোসর দলগুলি মড়াকান্না কাঁদিয়া দেশবাসীকে ভুলপথে চালিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সচেতন দেশবাসী সাময়িক কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, তবু তাহাদের কথায় কর্ণপাত করে নাই।

দীর্ঘ কংগ্রেসি শাসনে বিশ্বের দরবারে ভারতের অবস্থা ম্লান হইয়া গিয়াছিল, তাহা কী আর্থিক ক্ষেত্রে, কী পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে। তাই দেশবাসী দায়িত্বশীল ও সৎ প্রশাসক খুঁজিতেছিল। ২০১৪ সালে দেশবাসী তাহা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে পাইয়াছে। একের পর এক তাঁহার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে দেশ যতই অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র দুই ক্ষেত্রেই সম্মানের আসনে বসিতে চলিয়াছে, ততই কংগ্রেস ও বিরোধীরা পিছনের সারিতে চলিয়া যাইতেছে। তাহারা এতই অন্ধ যে দেশবাসীর নাড়ির সন্ধান আর পাইতেছে না। তাই তাহাদের আর্তনাদ আরও প্রকট হইতেছে। দিল্লি ও কলকাতার রাজপথে তাহাদের কালাদিবস পালন সেই আর্তনাদেরই নামান্তর।

সম্প্রতি মোদী সরকারের এই সাহসী সিদ্ধান্তে স্বীকৃতি দিয়াছে বিশ্বব্যাঙ্ক। ভারত এখন বিশ্বব্যাঙ্কের র‌্যাংকিংয়ে ১০০তম স্থানে উঠিয়া আসিয়াছে। ইহা সম্ভব হইয়াছে বিমুদ্রীকরণের কারণেই। মোদী বিরোধীরা চক্ষে ঠুলি পরিয়াছে, প্রকৃততথ্য তাহারা পড়িতে পারিতেছে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য বলিতেছে— নোট বাতিলের কারণে ১৮ লক্ষ সন্দেহজনক অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত হইয়াছে। নোট বাতিলের সময় জমা দেওয়া ২.৮৯ লক্ষ কোটি টাকার তদন্ত চলিতেছে। লেন-দেন সংক্রান্ত ৫.৫৬ লক্ষ নূতন মামলা রুজু হইয়াছে। ৫৬ লক্ষ নূতন করদাতা যুক্ত হইয়াছেন। নগদ ব্যবসায়ীরা নিয়মিত কর দেওয়া শুরু করিয়াছেন এবং ট্যাক্স রিটার্ন ফাইলের বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে ২৪.৭ শতাংশ। ব্যক্তিগত আয়কর আদায় বাড়িয়াছে ৪১.৭৯ শতাংশ। ব্যাঙ্কে ৩ লক্ষ কোটি টাকা আমানত জমা পড়িয়াছে। ডিজিটাল লেন-দেন বৃদ্ধি পাইয়াছে ৫৬ শতাংশ। ১ কোটির বেশি শ্রমিক ইপিএফ এবং ই এস আই সি-র আওতায় আসিয়াছে। ২.১ লক্ষ ভুয়ো কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন বাতিল হইয়াছে। ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার কোটি টাকার অবৈধ লেন-দেন ধরা পড়িয়াছে। বিমুদ্রীকরণের ফলে জালনোটের কারবারে ঘাতক প্রভাব পড়িয়াছে। জালনোটের বিপুল আমদানির ফলে ভারতের অর্থনীতি পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষজ্ঞরা এমনও দাবি করিয়াছেন, জালনোটের কারবারিরা জাতীয় অর্থনীতির বিকল্প অর্থনীতি দেশে কায়েম করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কারবারিদের পিছনে ছিল পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা। উদ্দেশ্য, জাতীয় অর্থনীতিকে ক্রমশ পঙ্গু করিয়া ভারতের উন্নয়নকে পর্যুদস্ত করিয়া তোলা। বিমুদ্রীকরণ তাহার মূলে আঘাত করিয়াছে। হাতে নগদ নাই, তাই কাশ্মীরে ইসলামি জিহাদিদের নাশকতামূলক কাজ অপেক্ষাকৃত কম। মাওবাদীরাও কোণঠাসা।

বিরোধীদের চোখে এই সুফলগুলি পড়িতেছে না। কারণ তাহাদের নিকট আগে পরিবার, দল, সর্বোপরি ভোট। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদীর নিকট আগে দেশ। তাই বিরোধীরা যতই কালোদিবস পালন করিবে, দেশবাসী ততই তাহাদের কালোতালিকাভুক্ত করিয়া বাতিলের খাতায় ফেলিবে।

সুভাষিতম্

দেশেরক্ষাসমং পুণ্যং দেশরক্ষাসমং ব্রতম্।

দেশরক্ষাসমো যাগো দৃষ্টো নৈব চ নৈব চ।।

দেশরক্ষার সমান পুণ্য, দেশরক্ষার সমান ব্রত এবং দেশরক্ষার সমান যজ্ঞ কখনোই দেখা যাবে না।

কেরলে এবিভিপি-র মহামিছিল

গণতন্ত্রের পতন রোধ করার শপথ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ‘কেরলে আমরা যেভাবে পারি গণতন্ত্রের পতন রোধ করব’। হাজার কণ্ঠের এই শপথবাক্য দিয়ে শেষ হলো কেরলে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ আয়োজিত মহামিছিল ‘চলো কেরল’। এই মিছিলে ভারতীয়ত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হাজার হাজার যুবক-যুবতী অংশ নেন। জাতীয় সংহতির প্রচার ও প্রসার ছাড়াও এই মিছিলের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কেরলে সরকার-সমর্থিত সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে জনমত সংগঠিত করা। খবরে প্রকাশ, সারা ভারত থেকে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের হাজার হাজার কার্যকর্তা রাজ্য সরকার এবং শাসক দল সিপিএমের প্ররোচনায় সংঘটিত সন্ত্রাসবাদ কেরলের মাটি থেকে উপড়ে ফেলতে তিরুঅনন্তপুরমে একত্রিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের শাসনকালে বিদ্যার্থী পরিষদের বেশ কিছু কার্যকর্তা খুন হয়েছেন। অভিযোগের তির সিপিএমের গুণ্ডাদের দিকে। কিন্তু এইসব মৃত্যুর তদন্তের প্রশ্নে

পিনারাই বিজয়নের সরকার বিস্ময়কর ভাবে নীরব। মিছিলে সমবেত কার্যকর্তাদের অভিবাদন জানিয়ে পরিষদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিনয় বিদরে স্লোগান দেন, ‘অভিমানম্ অভিমানম্ অভিমানম্ কেরলম। অপমানম্ অপমানম্ অপমানম্ কমিউনিজম।’ সেইসঙ্গে জানান, কেরল আদি শঙ্করাচার্যের স্মৃতিধন্য পুণ্যভূমি। রাজ্যটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শিক্ষাগত উৎকর্ষ এবং সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের কারণে সুপরিচিত। বিনয় বিদরে বলেন, ‘১৯৫৭ সালে রাজ্যে সিপিএম ক্ষমতায় আসার পর থেকে সাধারণ মানুষের দুর্দশা শুরু হয়েছে। পিনারাই বিজয়ন ক্ষমতায় আসার পর এখনও পর্যন্ত ১৪ জন নিরীহ মানুষ মারা গেছেন এবং কমপক্ষে ৩০০ জন আক্রান্ত হয়েছেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা এখানে এসেছি বামপন্থীদের আসল চেহারাটা সবার সামনে তুলে ধরার জন্য, সিপিএমের হার্মাদবাহিনীর আক্রমণে যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের পরিবারকে সাহায্য করার জন্য এবং হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে দাবিয়ে রাখার জন্য সিপিএম যে জল্লাদতন্ত্র কায়েম করেছে তা ধ্বংস করার জন্য।’

পরিষদের সর্বভারতীয় সংগঠন সচিব সুনীল আম্বেকর জানান, ২১ বছর আগে, ১৯৯৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সিপিএমের গুণ্ডা সুজিত অনু এবং কিম নামের তিন ছাত্রকে খুন করেছিল। কিন্তু তাঁদের আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী বামপন্থাকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, ‘বামপন্থীরা দিল্লিতে গিয়ে বলেন, তারা গরিব মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করছেন। কিন্তু ঘটনা হলো, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের জন্যে বহু গরিব মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এমনকী খুনও হয়েছেন।’ পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সংগঠন সম্পাদক কিশোর বর্মণ সিপিএমের দু'মুখো নীতির সমালোচনা করে বলেন, বামপন্থীরা সাধারণ মানুষের মনে ত্রাস সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত। কেরলের সংগঠন সচিব শ্যামরাজ নিহত কার্যকর্তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর পরিচয় করিয়ে দেন।

কেরলে স্বয়ংসেবক খুন, অভিযুক্ত সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ তিরঅনন্তপুরমে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের মহাসমাবেশ ‘চলো কেরল’-এর কার্যক্রম তখনও শেষ হয়নি, তার মধ্যেই খবর এল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এক স্বয়ংসেবক প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হয়েছেন। ঘটনাস্থল নেনমিনি। সময় বিকেল। অভিযোগের তির এবারও সিপিএমের দিকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিহত স্বয়ংসেবক আনন্দন (২৩) মোটর সাইকেলে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় একদল আততায়ী গাড়ি করে এসে তার পথরোধ করে এবং তলোয়ার-ছুরি-ভোজালি দিয়ে যথেচ্ছ কোপাতে থাকে। আনন্দনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে রাজ্য বিজেপি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রাজ্য বিজেপির সভাপতি কুম্মানম রাজাশেখরন বলেন, সিপিএম কোনওভাবেই প্রতিহিংসার রাজনীতি ছাড়তে প্রস্তুত নয়। এই ঘটনা তারই প্রমাণ। বিজেপি ইতিমধ্যেই ত্রিচুরের গুরুবায়ুর এবং মানালুরে বন্‌ধের ডাক দিয়েছে এবং মানুষ সেই ডাকে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিয়েছেন। বিজেপির অভিযোগ, ২০০১ সালের পর থেকে তাদের ১২০ জন কর্মী খুন হয়েছেন, যার মধ্যে ৮৪ জনই কান্নুরের বাসিন্দা। দলের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন গদিতে বসার পর খুন হয়েছেন ১৪ জন কর্মী।

বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে প্রহসন, পুড়ল ১৮টি হিন্দু বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আবার ফেসবুকে নবির 'অপমান'! এবং আবার বাংলাদেশের উন্মত্ত জনতা হিন্দুদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিল। বাংলাদেশে হিন্দু নিধন এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার সংক্রামক অসুখের মতো ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। এবার ঘটনাস্থল রংপুর জেলার ঠাকুরপাড়া গ্রামের হিন্দুপাড়া। সেখানে দুষ্কৃতীরা ১৮টা বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। সবকটিই ভস্মীভূত হয়। পুলিশের গুলিতে এক দুষ্কৃতীর মৃত্যু হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৫৩ জনকে। এই তাণ্ডবের প্রেক্ষাপটে রয়েছে একটি রহস্যজনক ফেসবুক পোস্ট। অভিযোগ, ঠাকুরপাড়া গ্রামের এক হিন্দু যুবক তার ফেসবুক পেজে নবি হজরত মহম্মদকে 'অপমান' করে একটি পোস্ট করেন। তাতেই খলেয়া ইউনিয়নের পলেয়াশাহ ওবালাবাড়ি গ্রাম এবং পাশের মমিনপুর গ্রাম থেকে প্রায় আট থেকে দশ হাজার মানুষ লাঠিসোঁটা নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। পুলিশ বাধা দেওয়ায় বিক্ষোভকারীরা তাদের লক্ষ্য করে যথেচ্ছ ইট আর লাঠি ছুঁড়তে থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশ ছর্‌রা গুলি এবং রাবার বুলেট ছুঁড়তে বাধ্য হয়। এসব যখন চলছে ঠিক তখনই বিক্ষোভকারীদের একাংশ হিন্দুপাড়ায় ঢুকে ১৮টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। টিটু রায়, সুবীর রায়, অমূল্য রায়, বিধান রায়, কৌশল্যা রায়, কুলীন রায়, ক্ষীরোদ রায়, দীনেশ রায় প্রমুখের বাড়ি ভস্মীভূত হয়। পুলিশ আধিকারিক জিন্নত আলি বলেন, 'পরিকল্পিত ভাবে হিন্দুবাড়িতে হামলা এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। আমরা এখনও পর্যন্ত ৫৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছি।' বাংলাদেশের মুক্তমনা মানুষের অভিযোগ, এভাবে হিন্দুদের উৎখাত করে রোহিঙ্গাদের বসানোর একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে।

চলতি অর্থবর্ষে চীনে ভারতের রপ্তানিতে ৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত-চীন সীমান্ত নিয়ে টেনশন যতই বাড়ুক না কেন এই আবহের কোনো আঁচ কিন্তু উভয়দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে পড়েনি। চলতি অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে চীনে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি তারই প্রমাণ। এক্ষেত্রে কিন্তু চীনের তরফে ভারতের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যের চুক্তিগুলি যাতে দ্রুত কার্যকরী করা যায় সে বিষয়ে সদর্থক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে খবর।

বাণিজ্য দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতের সর্ববৃহৎ বাণিজ্য অংশীদার চীন থেকে আমদানির তুলনায় ভারত থেকে সে দেশে রপ্তানির পরিমাণ বিপুল বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সীমান্তের এই দেশ থেকে চিরাচরিত বৈদ্যুতিন উপকরণ ও দামি ওষুধপত্রের বড়সড় আমদানি বহাল থাকায় রপ্তানিক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত ব্যালান্সে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি। সূত্র অনুযায়ী লৌহ আকরিক, তন্তু ও ফেরো অ্যালয়— এই তিনটি ক্ষেত্রেই রপ্তানির পরিমাণ অনেকাংশে বেড়েছে। প্রসঙ্গত, এই প্রতিটি কাঁচামালই চীনের উৎপাদনক্ষেত্রগুলিতে ব্যবহৃত হয়। বাণিজ্য দপ্তরের সূত্র অনুযায়ী সরকার নজর রাখছে যাতে সেরা গুণমানের লৌহ আকরিক রপ্তানি সূত্রে দেশের বাইরে না চলে যায়।

ইতিমধ্যে নব নিযুক্ত বাণিজ্যমন্ত্রী সুরেশ প্রভু এ যাবৎ নানা বিধি নিষেধের জালে আটকে থাকা বেশ কিছু জিনিসকে রপ্তানির আওতায় আনতে চীনের বাণিজ্যিক সর্বোচ্চ অধিকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে সে দেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি বাড়াবার দিকে এগিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই মর্মে প্রচলিত আইন কানুনেও কিছু শিথিলতা আনতে চায় যাতে দেশের কৃষিজাত পণ্যগুলির ক্ষেত্রে যেমন বাসমতী নয় এমন চালের রপ্তানি বাড়ানো যায়।

বাণিজ্যমন্ত্রী এই সূত্রে দেশের আমদানির পরিমাণ কমিয়ে আনতে চান। বাণিজ্য সচিব ঋতা টেওটিয়ার নেতৃত্বে তিনি বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গড়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি বৈদেশিক বাণিজ্যের বিষয়ে প্রতিটি ক্ষেত্র ধরে বিশেষ সমীক্ষা চালাতে উদ্যোগ নিতে চান।

চীন থেকে ভারতে বিপুল সংখ্যার স্মার্টফোন ও অন্যান্য বৈদ্যুতিন পণ্যের আমদানি সম্পূর্ণভাবে যে রোধ করা যাবে না তা মেনে নিয়েই সংশ্লিষ্ট কিছু ক্ষেত্রের আমদানিতে রাশ টেনে সরকার একটা ভারসাম্যের নীতি নিতে চাইছে। এই সূত্রে ভারতীয় ওষুধ কোম্পানিগুলির কাঁচামালের জন্য চীনের ওপর বড় রকমের নির্ভরতা কাটাতে সরকার দেশীয় কিছু কিছু উৎপাদনকারীকে এই কাঁচামাল তৈরির ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

চীনের উওকান গ্রামে গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ শহরের প্রতিটি রাস্তার মোড়ে রয়েছে নজরদারি ক্যামেরা। গুপ্তচরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। মায় আপনার বেডরুমে উঁকি দিলেও অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকতে হবে। এই হলো মহান গণতন্ত্র। তাও আবার বিপ্লবের পীঠভূমি চীনে। দক্ষিণ চীনের গুয়াংডাং প্রদেশের উওকান গ্রাম ছিল একসময় চীনের তৃণমূলস্তরের গণতন্ত্রের প্রতীক। আজ সেখানকার জমি-হাঙ্গরদের জমি-দখলদারির প্রতিবাদ করে বহু গ্রামবাসী জেলে, কারও বা দ্বীপান্তর হয়েছে। সম্প্রতি রয়টারের একটি সাংবাদিক প্রতিনিধিদল উওকানে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছেন গণতন্ত্রের পীঠভূমিতে সাধারণ মানুষের মত প্রকাশের ন্যূনতম স্বাধীনতাটুকুও নেই। তাঁরা সেখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। বহু মানুষ মুখ খুললেও অনেকেই আতঙ্কে মুখ খুলতে চাননি। সাংবাদিকরা অনুভব করেছেন যে প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁদের আর গ্রামবাসীদের ওপর পুলিশি নজর রয়েছে।

আন্তর্জাতিক চাপের মুখে চীনের কমিউনিস্ট সরকার রয়টারের সাংবাদিক-গোষ্ঠীকে উওকানে প্রবেশের অনুমতি দিলেও তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ পুলিশের নজরবন্দি ছিল। ১৯৮০ সাল নাগাদ চীনের প্রত্যন্ত গ্রামগুলি তথাকথিত গণতন্ত্রের আওতায় আসে। কিন্তু সেখানকার মানুষের

ভোটাধিকার সবসময় সরকারি নিয়ন্ত্রণে প্রতিফলিত হয়েছে। সূত্রের খবর, প্রাদেশিক স্তরে একশোজন কর্মী নিয়ে 'উওকান মাস ওয়ার্কিং গ্রুপ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাদের কাজ হলো গুপ্তচরদের নেটওয়ার্ক সচল রেখে নিরাপত্তা নজরদারি, সামগ্রিক নজরদারি ব্যবস্থা ও গ্রামে নৈশালোক বন্দোবস্তকে আরও জোরদার করা। ২০১১ সালে উওকানে সংশ্লিষ্ট চীনা আধিকারিকদের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণ সোচ্চার হন। এই প্রতিবাদে সাময়িক কাজ হয়। চীন সরকার পিছু হটার ইঙ্গিত দেন। ফলে আশা করা গিয়েছিল যে চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

তবে তারপর যত দিন গিয়েছে উওকানের ওপর চীনা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ আরও বেশি করে কায়েম হয়েছে। উওকানের প্রতিবাদী গোষ্ঠীর নেতা জুয়াং লিয়ং রয়টারের প্রতিনিধি দলকে জানিয়েছেন যে সেখানকার নাগরিকদের ওপরও ব্যক্তিগত অধিকারের ক্ষেত্রে চীনের ফাঁস আরও বেশি করে চেপে বসেছে। লিয়ংয়ের আরও বক্তব্য উওকান গ্রাম চীনের কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। চীন জুড়ে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের যে প্রয়াস চলেছে, তার মধ্যেই পড়ে উওকান। তাঁর মন্তব্য : 'এটা বর্তমান চীনের একটি অন্ধকারময় দিক। যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই। ব্যক্তিগত অধিকারও নেই।'

রয়টারের প্রতিনিধিরা এই ভয়াবহ পরিস্থিতির ব্যাপারে গুয়াংডং প্রাদেশিক সরকারের কাছে প্রশ্ন করলেও কোনো সাড়া মেলেনি। টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডায়না ফু এবং ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব্ টেকনোলজির (এম আই টি) গ্রেগ ডিস্টেলহর্স্ট তাঁদের শৈক্ষিক গবেষণাপত্র 'বর্তমান চীনের গণতন্ত্রে তৃণমূল স্তরে যোগদান ও অবদমন'-এ দেখিয়েছেন যে জি জিঙপিঙের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি জীবনের প্রতিটি স্তরে নাক গলাবার চেষ্টা করছে এবং মানুষের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে। জিঙপিঙের রাজনৈতিক প্রচারের মূল অভিমুখ হলো ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা এবং তা করতে গিয়েই চীনে গণতন্ত্র লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে মনে করেছেন সংবাদসংস্থার প্রতিনিধিদল।

মালদায় ডেঙ্গু, ডেথ সার্টিফিকেটে অন্য অসুখের নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত দু' সপ্তাহে মালদহ জেলা, দু'ই দিনাজপুর- সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যেভাবে ডেঙ্গু মহামারীর আকার ধারণ করেছে এবং ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে তাতে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে সাধারণ মানুষ। সদর হাসপাতাল, গ্রামীণ হাসপাতাল ও বেসরকারি নার্সিং হোমগুলিতে তিল ধারণের জায়গা নেই। অথচ রাজ্য সরকার এই মারণরোগকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে ডেঙ্গুতে মৃত ব্যক্তিদের 'অন্য রোগে মারা গেছে বলে লিখতে হবে' এই নির্দেশ দিয়েছেন সরকারি হাসপাতালগুলিকে। সম্প্রতি জ্বরের উপসর্গ নিয়ে রায়গঞ্জ ও মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন দুজন রোগী। গত ১০ নভেম্বর দুজনেরই মৃত্যু ঘটায় আতঙ্ক ছড়ায় এবং রোগীদের আত্মীয়স্বজন হাসপাতালে ভাঙচুর চালায়। মৃতেরা হলেন রায়গঞ্জের বাপ্পা সরকার (২৮) এবং মালদহ পুড়াটুলির সমাপ্তি দাস। ডাক্তারি রিপোর্টে উল্লেখ থাকলেও কারওরই ডেথ সার্টিফিকেটে ডেঙ্গুর কথা লেখা হয়নি। জেলা হেল্থ অফিসাররা কিংবা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ডেঙ্গুতে মৃত্যুর কথা স্বীকার করেননি। সমাপ্তির সার্টিফিকেটে ডেঙ্গুর বদলে 'মাল্টি অরগ্যান ফেলিওর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নিয়ে পরিবারের মানুষেরা ক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে ডাক্তাররা জানান, কোনোভাবেই মৃত্যুর কারণ ডেঙ্গু লেখা যাবে না। ডেঙ্গু নিয়ে সরকারের এই দমননীতি নির্লজ্জ ভণ্ডামিরই এক চরম দৃষ্টান্ত বলে অনেকেই মনে করছেন। বেসরকারি সমীক্ষায় কেবল উত্তরবঙ্গেই কয়েকশো মানুষ ডেঙ্গুতে মারা গেছেন। হাসপাতালগুলিতে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক চিকিৎসা না হওয়ায় এবং হাতুড়ে ডাক্তারদের চিকিৎসায় আধমরা রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করানোর ফলে আগামী দিনে ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্বাস্থ্য দপ্তর দেখছেন, সুতরাং এই মৃত্যু মিছিলে তিনি নেই বলে রেহাই পাবেন না।

চাবাহার বন্দরে ভারতের জাহাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত, ইরান এবং আফগানিস্তানের ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতা-চুক্তির প্রথম ধাপ হিসেবে ভারত ইরানের চাবাহার বন্দরে গমবোঝাই জাহাজ পাঠাল। তিন দেশের অভ্যন্তরীণ এবং সামরিক যোগাযোগ আরও বাড়ানোর জন্য, সেই সঙ্গে পাকিস্তানের জল ও আকাশপথ পরিহার করার জন্য যে চুক্তি হয়েছিল গত বছরের মে মাসে, তারপর এই প্রথম ভারত জাহাজ পাঠাল। ২৯ অক্টোবর ভারত, আফগানিস্তান ও ইরানের বিদেশ মন্ত্রী যথাক্রমে সুষমা স্বরাজ, সালাউদ্দিন রব্বানি এবং জাভেদ জারাফ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে এই বাণিজ্যযাত্রার সূচনা করেন। আগামী ছ'মাসে আরও বেশ কয়েকটি ভারতীয় জাহাজ গম নিয়ে আফগানিস্তান পৌঁছবে। উল্লেখ্য, আফগানিস্তানে ১০.১ কোটি টন গম রপ্তানি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভারত। চাবাহার বন্দর প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চীনের 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' কর্মসূচির অন্তর্গত পাকিস্তানের গোয়াদর বন্দরের প্রতিষেধক খুঁজতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইরানের চাবাহার বন্দরের আধুনিকীকরণে সাহায্যের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এর জন্য চীন যে চাপে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

উবাচ

"কেরলে সঙ্ঘকার্যকর্তা আনন্দকে হত্যা করে সিপিএম তাদের দাবির সত্যতাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে যে, তারা হত্যার রাজনীতি ও সংস্কৃতি বন্ধ করার জন্য আলাপ-আলোচনা চায়।"

রাকেশ সিন্হা
অধ্যাপক দিল্লি ইউনিভার্সিটি

কেরলে সিপিএম গুণ্ডাদের দ্বারা স্বয়ংসেবক হত্যা প্রসঙ্গে

"রাজনৈতিক অনুপ্রবেশের জেরে বাঙালির জীবনে মূল্যবোধের মৃত্যু হয়েছে।"

তথাগত রায়
রাজ্যপাল, ত্রিপুরা

সম্প্রতি সিউড়িতে এক স্মারক বক্তৃতায়

"নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বহু জটিলতার অবসান হয়েছে। ভারত আমেরিকার স্বাভাবিক মিত্র।"

ডোনাল্ড ট্রাম্প
রাষ্ট্রপতি, আমেরিকা

ম্যানিলায় আসিয়ান গোষ্ঠীর সম্মেলনে বক্তব্য প্রসঙ্গে

"একবিংশ শতক হোক ভারতবর্ষের। প্রত্যেক ভারতীয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

ম্যানিলায় অনাবাসী ভারতীয়দের সামনে বক্তব্যে

"গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের ফল নিয়ে এত জল্পনার দরকার নেই। নরেন্দ্র মোদীর রাজ্যে বিজেপিই জয়ী হবে।"

নীতীশ কুমার
বিহারের মুখ্যমন্ত্রী

গুজরাটের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে

মুকুল রায় পথ দেখিয়েছেন, বাকিরা পথ খুঁজছেন

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী,
নবান্ন, মন্দিরতলা, হাওড়া

আপনি এখন নবান্ন থেকেই দল চালান। তাই অফিসের ঠিকানাতেই দলীয় বিষয়ে চিঠি পাঠালাম।

দিদি আপনার বিপদ দেখে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু দিদি জানেন, মুকুল আসলে আপনাদের শত্রু নন। তিনি দল বদলেছেন। আসল শত্রুরা দল বদলের সুযোগ পায়নি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে অনেক কিছু করে যাচ্ছে।

কেন তৃণমূল ছাড়লাম? এর উত্তর দিতে ধর্মতলায় ফাইল খুলে অভিযোগ শানিয়েছেন মুকুল রায়। বলেছেন, "বিশ্ববাংলা সরকারের কোনও সংস্থা নয়। এটা একটা কোম্পানি। এর মালিক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল বলে, 'জাগো বাংলা' তাদের মুখপত্র। এর মালিকের নামও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের যত লোগো, লিফলেট, পোস্টার, ব্যানার হবে, সব ছাপানোর দায়িত্বে অভিষেকের সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলের নেতা, কর্মীরা এটা জানেন না।"

মুকুল রায়কে সঙ্গে পেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই উৎসাহিত বিজেপি। গেরুয়া বাহিনী মনে করছে, তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে অস্ত্র এখনও পর্যন্ত প্রয়োগ করেছেন মুকুল তা মূল ফিল্মের ট্রেলার মাত্র। সেই ট্রেলারেই তিনি যা অভিযোগ এনেছেন, তাতেই সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব থেকে দলের মহাসচিব—সকলকে একাধিক সাংবাদিক সম্মেলন করতে হয়েছে। মুকুল জানিয়েছেন,

এখনও অনেক কিছু তিনি ফাঁস করবেন, তবে দফায় দফায়।

সারদাকর্তা সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে ডেলোয় হওয়া বহুচর্চিত বৈঠক- ঘটিত বিতর্ক নিয়েও হাটে হাঁড়ি ভেঙেছেন মুকুল। বলেছেন, "সারদা নিয়ে কুণাল ঘোষ জেল খাটল। ডেলোর বৈঠকে আমিও ছিলাম। সঙ্গে তৎকালীন পর্যটন সচিব আর কুণাল ঘোষও ছিলেন। ব্যবসা সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনার পরে আমরা বেরিয়ে গিয়েছিলাম। সুদীপ্ত সেন বলেছে, ৮৪০ কোটি টাকা পর্যটন, সংবাদমাধ্যম এবং অ্যাম্বুলেন্সে বিনিয়োগ করেছে। এর জবাব কি মুকুল রায় দেবে?"

কুণাল ঘোষের নাম করেছেন মুকুল রায়। তাঁর আমলেই দল থেকে সাসপেন্ড করা হয় রাজ্যসভার সাংসদ কুণালকে। যদিও সেই বহিষ্কারের দলীয় চিঠি এখনও তাঁর ঠিকানায় পৌঁছয়নি বলে দাবি করেন কুণাল ঘোষ। কুণাল সুযোগ পেলেই ঘোষণা করেন যে, তিনি দলের অনুগত সৈনিক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নেত্রী। এখনও তিনি সাংসদ হিসেবে প্রাপ্য ভাতার অংশ দলকে দেন। কিন্তু তিনি একের পর এক প্রশ্ন তুলে দলের অস্বস্তিও বাড়িয়ে দেন।

মুকুল রায় সমাবেশ করার পরে তিনি একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলেছেন। সেই প্রশ্নে মুকুল রায়ের থেকেও বেশি অস্বস্তি তৃণমূল কংগ্রেসের। কারণ, প্রশ্নগুলি বিজেপি নেতা মুকুল রায়কে নয়, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়কে।

দিদি, একা কুণাল নয়। এমন প্রশ্ন আপনার দলের অনেক অনেক ভাইয়ের। তাঁরাও অনেক খুঁটিনাটি জানেন। মুকুলদা পথ দেখিয়েছেন। বাকিরা পথ খুঁজছেন। পথ পেয়েও যাবেন। তাই সাবধান দিদি। একটু সামলে থাকুন।

—**সুন্দর মৌলিক**

রোহিঙ্গাদের ভারতে আশ্রয় না দিয়ে মোদী সরকার সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে

গূঢ় পুরুষের কলম

সীমান্ত পেরিয়ে প্রায় ১১ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। এরা মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশের বাসিন্দা। এরা প্রায় সকলেই মুসলমান এবং হিংসাশ্রয়ী। নরহত্যা আর ডাকাতি এদের পছন্দের পেশা। রাখাইন পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা দুর্গম এলাকা। এই এলাকায় কৃষি শিল্প কিছুই নেই। রোহিঙ্গাদের ৯৯ শতাংশ নিরক্ষর। কারণ, রাখাইন অঞ্চলে স্কুল খোলার সাহস মায়ানমার সরকারের নেই। প্রথাগত শিক্ষাকে রোহিঙ্গারা ধর্ম বিরোধী বলে মনে করে। রাখাইন মায়ানমারের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানে আইন আদালত বলে কিছুই নেই। মায়ানমারের ভাষাও এখানে অচল। টিভি, রেডিও নেই। অবাধ এবং মুক্ত যৌনাচারই রোহিঙ্গাদের একমাত্র বিনোদন। এমন একটি বিচ্ছিন্ন এলাকা এবং জনগোষ্ঠীই খুঁজছিল আই এস ইসলামি জঙ্গিরা। যাদের শাখা প্রশাখা দ্রুত ছড়াচ্ছে পাকিস্তানে। পাক জঙ্গিরা গত দু'বছর ধরে রোহিঙ্গাদের জঙ্গি প্রশিক্ষণ, হাতিয়ার সরবরাহ করে চলেছে। উদ্দেশ্য, বাংলাদেশ এবং তার বন্ধু ভারতকে বিপদে ফেলা।

রোহিঙ্গরা জাতিগতভাবে পাকিস্তানকে তাদের বন্ধু-রাষ্ট্র বলে মনে করে। মায়ানমার ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার ২ বছর আগে ১৯৪৬ সালের মে মাসে রাখাইনের রোহিঙ্গা মুসলমানরা মহম্মদ আলি জিন্নাহর সঙ্গে দেখা করে ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। প্রাক্তন বর্মা এবং অধুনা মায়ানমার তখন ব্রিটিশ রাজের হাতে। তাই জিন্নাহ্র সাহস হয়নি ব্রিটিশের হাত থেকে রাখাইন কেড়ে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার। তিনি রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধি দলকে পরামর্শ দেন রাজনৈতিক আন্দোলন করার। জিন্নাহ চেয়েছিলেন হিংসাশ্রয়ী রাজনৈতিক আন্দোলন হলে ব্রিটিশ শাসকরা রাখাইন প্রদেশকে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে বাধ্য হবে। প্রতিনিধিদল ফিরে গিয়ে সেখানে আরাকান মুসলিম লিগ গঠন করে হিংসাত্মক লড়াইয়ের জন্য রোহিঙ্গাদের ডাক দেয়। সেই থেকে রোহিঙ্গারা মায়ানমার পুলিশ ও সেনাদের উপর গেরিলা কায়দায় হামলা চালিয়ে রাখাইনে হত্যা ও সন্ত্রাস কায়েম করেছে। আফগানিস্তানের আলকায়েদার প্রাক্তন জঙ্গিদের দিয়ে প্রশিক্ষণ দিতে গত তিন বছরে কোটি কোটি ডলার খরচ করেছে পাক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই।

২০১৬ সালে পাক-প্রশিক্ষিত রোহিঙ্গা জঙ্গিরা রাখাইনের মংডু শহরের কাছে হামলা চালিয়ে মায়ানমার সীমান্তরক্ষী ৯ জন জওয়ানের মুণ্ড কেটে নিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে ছিল ২০১৬-র অক্টোবর মাসে। এর কয়েকদিন পরেই রোহিঙ্গা জঙ্গিরা মায়ানমার সেনা ছাউনিতে হামলা চালিয়ে চারজন সেনার মুণ্ড কেটে নিয়ে যায়। এরপরেই ইয়াঙ্গন সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে রোহিঙ্গা জঙ্গিদের দমন করতেই হবে। মায়ানমারের জনপ্রিয় নেত্রী অং সান সুকি সামরিক অভিযানে সবুজ সঙ্কেত দিলে রাখাইনে সেনাবাহিনী পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। মায়ানমারের রাষ্ট্রপতি থিন কাওয়ার দাবি করেছেন, '৯৬ শতাংশ রোহিঙ্গা যুবক প্রশিক্ষিত জঙ্গি। তাদের লক্ষ্য, রাখাইনকে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র করা।'

ভারত-সহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মী, বুদ্ধিজীবীরা রোহিঙ্গা নরমুণ্ড শিকারি জঙ্গিদের জন্য কেঁদে ভাসাচ্ছেন। একবারও ভেবে দেখছেন না যে নরখাদক বাঘদের আদর করে ঘরে পুষলে তার পরিণাম কী হয়। কাশ্মীরে ভারত এই ভুল করেছিল। পাক হানাদারদের বিতাড়িত করার পর সাম্যবাদী নেহরু ভারতীয় সেনাদের ফিরে আসতে বলেছিলেন। তার দাম আজও আমরা দিচ্ছি। প্রাণের বিনিময়ে। কাশ্মীরের কৌশলেই পাক জঙ্গিরা মায়ানমারে অশান্তি ছড়াতে চাইছে। পুরুষানুক্রমে রোহিঙ্গাদের পেশা খুন, ডাকাতি, রাহাজানি। এই রকম হিংস্র জনজাতিদের জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেওয়াটা ইসলামি জেহাদিদের সহজতম কাজ। রাখাইনের পাহাড় ভিক্টোরিয়ার মাথায় পাক জঙ্গি প্রশিক্ষণের প্রধান শিবির। এই শিবিরগুলি ধ্বংস করতে গেলে আকাশপথে আক্রমণ করতে হবে মায়ানমার বিমানবাহিনীকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে মায়ানমার সরকার পিছিয়ে এসেছে। অথচ জঙ্গি শিবিরগুলিকে বাঁচিয়ে রেখে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় না দিয়ে মোদী সরকার সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই শরণার্থীরা একবার ঢুকলে আর ফিরবে না। আবার বলছি, রোহিঙ্গারা পেশাদার অপরাধী। পাকিস্তান ভারতে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশে সবরকম সাহায্য করবে। এতে একই সঙ্গে বাংলাদেশ এবং ভারতকে বিপদে ফেলা যাবে। মানবাধিকারের নামে বুদ্ধিজীবীরা যত খুশি মায়াকান্না কাঁদলেও রোহিঙ্গাদের এখানে শিকড় গেড়ে বসতে দেওয়া হবে না। কারণ, তা হবে আত্মহত্যার শামিল। বাংলাদেশ সরকার ধর্মের নামে রোহিঙ্গা মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছে। এর পরিণাম যে ভয়ঙ্কর সেটি বুঝতে বেশিদিন সময় লাগবে না। ■

কালোটাকার পঙ্কে ডুবে থাকা ভারত চান নাকি বিরোধীরা?

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

গত ৮ নভেম্বর দিনটিকে 'কালা দিবস' হিসেবে পালন করার ডাক দিয়েছিলেন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ, গত বছর এই দিনটিতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী বিমুদ্রীকরণের সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য— প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার ফলে দেশের অর্থনীতিতে বড় আঘাত লেগেছে। সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত হয়েছেন। ব্যবসাপত্র লাটে উঠেছে। ছাঁটাই এবং বেকারি বেড়েছে। অতএব এই দিনটিকে 'কালা দিবস' হিসেবে পালনের ডাক দিয়েছিলেন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমাবধি এই নোটবন্দির বিরোধিতায় সরব। শুধু তিনি একা নন, সঙ্গে দোসর হিসেবে পেয়েছেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বালখিল্য সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধী এবং গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল গোছের বামপন্থীদের। প্রশ্ন হচ্ছে, গত এক বছর ধরে তো এঁরা নোটবন্দির বিরোধিতা করছেন— কিন্তু শুনছে কে? ৮ নভেম্বর, কালা দিবস পালন করার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রত্যেকের প্রোফাইল পিকচারটি কালো করে দিতে। দেখা গেল সে আহ্বানে বিশেষ সাড়া মিলল না। বরং নেত্রীর নিজের দলেরই বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সাংসদ এবং নেতানেত্রী তাঁদের প্রোফাইল পিকচার কালো করলেনই না। তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা ৮ নভেম্বর বেশ কিছু জায়গায় ঘটা করে প্রতিবাদ সভা করল, নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল পোড়াল, তাদের বশংবদ সংবাদমাধ্যম তা সাতকাহন করে প্রচারও করল; কিন্তু এই প্রতিবাদ সভাগুলি তেমন জমল কই? সাধারণের জীবনযাত্রায় এইসব সভা কোনোরকম চাঞ্চল্যই সৃষ্টি করল না। মনে রাখতে হবে, গত বছর ৮ নভেম্বর নরেন্দ্র মোদী যখন বিমুদ্রীকরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন— তখন উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন দরজায় কড়া নাড়ছে। সেই সময় উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর দল বিজেপির কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ওইরকম একটি সময় বিমুদ্রীকরণের সিদ্ধান্তে অনেকের ভ্রূ কুঁচকেছিল। রাজনীতি বিশেষজ্ঞরা তো বলেই বসেছিলেন— মোদীর এই সিদ্ধান্ত উত্তরপ্রদেশে বিজেপির ভরাডুবি ডেকে আনবে। কিন্তু নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে চটকদারি পপুলিস্ট রাজনীতির পথে হাঁটার চেষ্টা মোদী করেননি। বিমুদ্রীকরণের সিদ্ধান্তে মোদী অটল ছিলেন। এবং উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিল। নোটবন্দির কয়েকমাস পরেই উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির এই সাফল্য এটি প্রমাণ করেছিল— মোদী বিরোধীরা যাই বলুন না কেন, যে প্রচারই চালান না কেন— দেশের মানুষ মোদীর এই সাহসী পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে। তার আরও প্রমাণ— এর পরেও যে কটি নির্বাচন হয়েছে, সবকটিতেই মোদী এবং বিজেপির সাফল্য অব্যাহত রয়েছে।

সমস্যা হচ্ছে, দেশের মানুষ যা ভাবেন, যা চান— মমতা, রাহুল, বামপন্থীরা ঠিক তার উল্টোটাই ভাবেন, উল্টোটাই চান। গত সাত দশক ধরে আমাদের দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রে সব কিছু মেনে নেওয়া এবং চলতে দেওয়ার যে ভীরু মানসিকতা তৈরি হয়েছে, চলতি স্রোতে গা ভাসিয়ে রাজনীতি করায় যেভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন নেতা-নেত্রীরা— রাহুল, মমতা বা বামপন্থীরা তার ব্যতিক্রম নন। তাঁরা সাহসী হতে পারেন না, সাহসী হতে চানও না। চলতি হাওয়ায় গা ভাসিয়ে চটকদারি পপুলিস্ট রাজনীতি করে নিজেদের রাজনৈতিক আখের গুছাতে চান। সত্তর বছর পর, নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী বোধহয় প্রথম রাজনীতিক— যিনি এই সস্তা পপুলিস্ট রাজনীতির ছকের বাইরে এসে অন্য কিছু করার মতো সাহস দেখিয়েছেন। সব কিছু মেনে নেওয়া এবং চলতে দেওয়ার বদলে ঘুণ ধরা ব্যবস্থাটিতে পরিবর্তন করা যে যায়— সে নিদর্শন দেশের মানুষের সামনে রেখেছেন। তাই কালোটাকার সমান্তরাল অর্থনীতি রোধে নোটবন্দির মতো কঠোর সিদ্ধান্ত বা তিন তালাক প্রশ্নে লাঞ্ছিত-অত্যাচারিত মুসলমান মহিলাদের পাশে দাঁড়ানোর সাহস একমাত্র নরেন্দ্র মোদীই দেখাতে পেরেছেন। সেক্ষেত্রে কোনো পপুলিস্ট বা তোষণের রাজনীতি তাঁর সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি। মোদীর ম্যাজিক এখানেই। আর এই ম্যাজিকই নির্বাচনগুলিতে মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপিকে সাফল্য এনে দিয়েছে।

মোদী-বিরোধী এবং তাদের বাজনদার সংবাদমাধ্যমগুলি যতই 'গেল গেল' রব তুলে দিক না কেন— আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদরা কিন্তু তাঁদের সুরে সুর মেলাতে পারছেন না। বরং, বেশ কয়েকজন অর্থনীতিবিদ এইরকম বলেছেন যে, বিমুদ্রীকরণের সুফল ভারতীয় অর্থনীতি অচিরে লাভ করবে। তাঁদের বক্তব্যের পক্ষে বেশ কিছু যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা এবং তথ্যাদি তাঁরা পেশ করেছেন। মোদী- বিরোধীদের বাজনদার সংবাদমাধ্যমগুলি অবশ্য এই অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য প্রকাশ করছে না। করছে না এই কারণেই—করলেই তাদের মিথ্যার বেসাতিটি ফাঁস হয়ে যাবে। এই অর্থনীতিবিদদের বিশদ ব্যাখ্যায় না ঢুকেও আমরা সংক্ষেপে তথ্যপ্রমাণ সহযোগে একটু দেখে নিতেই পারি বিমুদ্রীকরণের এক বছরে ভারতীয় অর্থনীতি কী সুফল লাভ করল।

বিমুদ্রীকরণের মূল উদ্দেশ্য ছিল কালোটাকার বিরুদ্ধে লড়াই। দেশের ভিতর কালোটাকার যে সমান্তরাল অর্থনীতি জাঁকিয়ে বসেছিল— তার দূরীকরণই ছিল নোটবন্দি ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য। এটাও মনে রাখা দরকার, হঠাৎ রাতারাতি ঘুম থেকে উঠে প্রধানমন্ত্রী বিমুদ্রীকরণের সিদ্ধান্ত

নিয়েছিলেন, বিষয়টা এমন নয়। এটি কোনো চটজলদি নেওয়া সিদ্ধান্ত নয়। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছেন— তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে অত্যন্ত সুচিন্তিত এবং পরিকল্পিত ভাবেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর কথায় বোঝাই যাচ্ছে, ২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার কালোটাকার সমান্তরাল অর্থনীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার পন্থাগুলি নিয়ে ভাবছিল এবং তারই কার্যকরী রূপ গত বছর ৮ নভেম্বর বিমুদ্রীকরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা। অর্থমন্ত্রী আরও বলেছেন, বিমুদ্রীকরণ, বিদেশে গচ্ছিত সম্পত্তি বিষয়ে আইন প্রণয়ন, বেআইনি সম্পত্তি তদন্তে বিশেষ দল গঠন এবং অভিন্ন পণ্য ও পরিষেবা কর চালু করা— এই সবই কালোটাকা রোধের পরিকল্পনার অঙ্গ। কোনোটিই কোনো বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপ নয়। বিমুদ্রীকরণের পদক্ষেপের পর গত একবছরে কী কী সুফল লাভ করা গিয়েছে?

(১) ২০১৬ সালে আয়কর রিটার্ন দাখিলের শেষ দিন, রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা ছিল ২২ লক্ষ। এই বছর, ২০১৭-র ৫ আগস্ট, আয়কর রিটার্ন দাখিলের শেষ দিনে তা পৌঁছেছে ৫৬ লক্ষে। ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে স্বেচ্ছায় ঘোষিত করদাতার সংখ্যা ৩৪.২৫ শতাংশ বেড়েছে। এই ধরনের করদাতাদের জমা দেওয়া অগ্রিম করের পরিমাণও গত এপ্রিল থেকে আগস্টের মধ্যে ৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) বিমুদ্রীকরণের পর ২ লক্ষ ৯৭ হাজার সন্দেহভাজন কোম্পানিকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ নোটিশ জারি করার পর ২ লক্ষ ২৪ হাজার কোম্পানিকে রেজিস্টার অব কোম্পানিজের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কালো তালিকাভুক্ত এই কোম্পানিগুলির ভিতর আবার ২৮ হাজার ৮৮টি কোম্পানির ৪৯ হাজার ৯১০টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে জানা গিয়েছে, ২০১৬-র নভেম্বর থেকে অনথিভুক্তির দিন পর্যন্ত এইসব অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার ২০০ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। এইসব কোম্পানিগুলির ভিতর অনেকেরই আবার একশোটিরও বেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এদের মধ্যে একটি কোম্পানির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ২১৩৪। আয়কর দপ্তর ১১৫০টিরও বেশি কোম্পানির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিমুদ্রীকরণের পর প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, এই কোম্পানিগুলির মাধ্যমে ১৩ হাজার ৩০০ কোটি টাকারও বেশি বেআইনিভাবে পাচার হয়েছে।

(৩) নোটবন্দির পরবর্তী সময়ে সেবি শেয়ারবাজারে 'গ্রেডেড সার্ভেল্যান্স' ব্যবস্থা চালু করেছে। এতদিন এদেশে অসাধু ব্যবসায়ী এবং শেয়ার ব্রোকাররা বসে যাওয়া এবং সাসপেন্ড হয়ে যাওয়া কোম্পানিগুলিকে শেয়ার বাজারে ব্যবহার করত। কিন্তু সেবি এখন এই ধরনের ৪৫০টি কোম্পানিকে চিহ্নিত করে তাদের শেয়ার বাজারের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে এবং তাদের প্রোমোটারদের ডি ম্যাট অ্যাকাউন্টগুলি সিজ করে দিয়েছে।

(৪) আয়কর বিভাগ থেকে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে— তাতে দেখা যাচ্ছে, নোটবন্দির পর ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের তুলনায়, ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে আয়কর দপ্তর কর্তৃক বাজেয়াপ্ত নগদ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আয়কর দপ্তরের তল্লাশির ফলে বাধ্যতামূলক ভাবে স্বীকৃত অঘোষিত আয়ের পরিমাণ ১৫ হাজার ৪৯৭ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের চেয়ে এর পরিমাণ ৩৮ শতাংশ বেশি। আয়কর দপ্তর সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে এও দেখা যাচ্ছে, নোটবন্দির পর বাধ্যতামূলকভাবে স্বীকৃত অঘোষিত আয় এবং খুঁজে বের করা কালোটাকার মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৯ হাজার ২১৩ কোটি টাকা। পরিমাণটা নেহাত কম নয় মনে রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার আশা প্রকাশ করেছে, ২০১৭ সালের ৩১ জানুয়ারি থেকে যে 'অপারেশন ক্লিন মানি' অভিযান চালু হয়েছে তাতে এই টাকা উদ্ধারের পরিমাণ আরো বাড়বে।

(৫) নোটবন্দির আর একটি অন্যতম সুফল হলো, জালনোটের মাধ্যমে কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গিরা যেসব জেহাদি কাজকর্ম চালাতো— তা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছে। ২০১৬-১৭ আর্থিক বর্ষে দেখা যাচ্ছে ১ হাজার টাকার জালনোট ধরা পড়ার সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৩ হাজার থেকে বেড়ে ২ লক্ষ ৫৬ হাজার হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সূত্রে জানা যাচ্ছে, ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে ৫০০ টাকার নোটে প্রতি ১০ লক্ষে ২.৪টি এবং ১ হাজারের নোটে ৫.৮টি জালনোট ধরা পড়ত। নোটবন্দির পর এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫.৫টি এবং ১২.৪টি।

নরেন্দ্র মোদীর বিমুদ্রীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ছিল কালোটাকার বিরুদ্ধে লড়াই। সে লড়াই যে একেবারে বিফলে যায়নি— এই তথ্যগুলি সে কথাই বলে দিচ্ছে। মোদীর নোটবন্দির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাঁরা আজ এত হইচই শুরু করেছেন— তাঁরা এইসব তথ্যগুলিকে কখনই প্রকাশ্যে আনছেন না। আনবেনও না। কারণ, তাহলে তাঁদের সংকীর্ণ রাজনীতিটি প্রকাশ হয়ে পড়বে। একথা অনস্বীকার্য— গত সত্তর বছরে দেশের ভিতরে যে ময়লা জমেছে— তা মাত্র পাঁচ বছরে সাফ করা অসম্ভব। নরেন্দ্র মোদীও মাত্র পাঁচ বছরে তা পারবেন না। এ ময়লা পুরোপুরি সাফ করতে গেলে আরও দশবছর সময় তাঁর প্রয়োজন। কিন্তু তিনি যে কাজটি করেছেন— তাই-বা ক'জন পারে? কোনোরকম প্রশংসা বা সমালোচনার ধার না ধেরে এই জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার করার কাজটি তিনি শুরু করে দিয়েছেন। বুকের পাটা না থাকলে একাজ করা যায় না। সে বুকের পাটা অবশ্যই নরেন্দ্র মোদীর বিরোধীদের নেই।

নোটবন্দি নিয়ে যাঁরা আজ নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা করতে রাস্তায় নেমে পড়েছেন, তাঁদের কাছে একটিই প্রশ্ন— কাদের স্বার্থ রক্ষা করছেন, তা তাঁরা ভেবে দেখছেন তো? নোটবন্দির ফলে যে হাজার হাজার কোটি কালোটাকার কারবারিদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে— তাদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য এই বিরোধীরা আজ ময়দানে নেমে পড়ছেন না তো? পরিষ্কার করে বলুন— কোন ভারত এঁরা চান— স্বচ্ছ ভারত, না, কালোটাকার পাঁকে ডুবে থাকা ভারত? এঁরা যেন মনে রাখেন, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার নির্বাচন সপাটে এদের গালে চড় কষিয়েছিল। সামনেই আসছে গুজরাট বিধানসভার নির্বাচন। ■

বিশেষ প্রতিবেদন

চীনের জলসীমা ঘিরে ভারতের চক্রব্যূহ

সাধন কুমার পাল

ইরানের রাষ্ট্রপতি স্বাগত জানাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে।

প্রথম থেকেই দলাই লামার অরুণাচল সফর নিয়ে তীব্র আপত্তি ছিল চীনের। দলাই লামাকে অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং যাওয়ার অনুমতি দিলে পরিণতি ভালো হবে না বলে হুমকিও আসছিল চীনের তরফ থেকে। ভারত এই আপত্তিকে একেবারেই পাত্তা দেয়নি। ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু দলাই লামার সফরসঙ্গী হলেন। সেখান থেকেই জানিয়ে দিলেন অরুণাচল প্রদেশ কোনো ভাবেই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এটি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে সম্পন্ন হলো দলাই লামার অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং সফর। হুমকি অগ্রাহ্য করার বদলা হিসেবে চীন অরুণাচল প্রদেশের ছয়টি জেলার নাম পাল্টে চীনা নাম ঘোষণা করে কূটনৈতিক ভাবে ভারতকে ধাক্কা দেওয়ার প্রয়াস করেছে। প্রমাণ দিয়েছে দলাই লামার সফর নিয়ে চীনা হুমকি ফাঁকা আওয়াজ ছিল না।

দীর্ঘদিন ধরেই চীন অরুণাচল প্রদেশকে 'দক্ষিণ তিব্বত' হিসেবে দাবি করে নিজেদের অধিকার কায়েমের চেষ্টা করছে। এই বদলা সেই প্রয়াসেরই অঙ্গ। গত ১৪ এপ্রিল সরকারি ভাবে চীনা, তিব্বতি এবং রোমান হরফে অরুণাচল প্রদেশের ছ'টি জায়গার নামকরণ হয়েছে। চীনের বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র লু কাংয়ের দেওয়া তথ্য অনুসারে রোমান ভাষায় এই ছ'টি নাম হলো মিলা রি, ওগিয়ানলিং, মেইনকুকা, ক্যুয়োইডেনগারবো রি, বুমো লা এবং নামকাপার রি। চীনের বিদেশ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে অদূর ভবিষ্যতে অরুণাচল প্রদেশের আরও কিছু স্থানের নাম চীন ওদের মতো করে বদলাবে। অবশ্য এই নামকরণের আগে চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং সেনাবাহিনীকে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তৈরি থাকতে বলেছেন। চীনের দাবি এই সমস্ত নাম ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং প্রশাসনিক দৃষ্টিতে অরুণাচল প্রদেশের উপর চীনের অধিকারের পরিচয়বাহী। ভারতের বিদেশমন্ত্রক থেকে চীনকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে নাম পরিবর্তন করে কোনো বৈধ বিষয়কে অবৈধ করা যায় না।

এরকম সম্ভাবনাও আছে যে অদূর ভবিষ্যতে চীন আবার অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন শহরের নাম পরিবর্তন করে জাল নথির মাধ্যমে এই সমস্ত শহরের সঙ্গে চীনের হাজার বছরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করবে এবং ইন্টারনেটের বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মহলে অরুণাচল প্রদেশের উপর নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাবে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানচিত্রে চীন নিজেদের দাবি রেখাঙ্কনের প্রয়াস করবে। এমনও হতে পারে গুগুল ম্যাপ বা অন্যান্য ম্যাপিং ওয়েব সাইটে প্রভাব বিস্তার করে চীন নিজেদের দাবির পক্ষে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করার প্রয়াস চালাবে। এখানে উল্লেখ্য যে গুগুল ম্যাপ বা অন্য কোনো প্রাইভেট ম্যাপিং সাইটে কোনো স্থানের নাম পরিবর্তন করলেও তা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় না।

কোনো দেশের কোনো স্থানের নাম পরিবর্তন করতে হলে সেই দেশকে ইউনাইটেড নেশনস-এর গ্লোবাল জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্টকে জানাতে হয়। ইউনাইটেড নেশনস-এর নিয়ম অনুসারে টপোগ্রাফাররা ওই জায়গায় গিয়ে নতুন নামের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে থাকেন। ওই অঞ্চলে বসবাসকারী ও আশপাশের এলাকায় বসবাসকারী মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে কথা বলে নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও গৃহিত সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা যাচাই করেন। সমস্ত তথ্য সংগ্রহের পর ইউনাইটেড নেশনস-এর নেমস্ ব্যুরোর কাছে পাঠানো হয়। এরপর ইউনাইটেড নেশনস্-এর টিম এটা তদন্ত করে দেখেন যে ওই নাম ও নামের বানান সম্পর্কে ওই এলাকার প্রশাসনিক মহল সহমত কিনা। ইউনাইটেড নেশনস্-এর প্রক্রিয়াটিকে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অব জিওগ্রাফিকাল নেমস বলা হয়। চীন যে-ছয় জায়গার নাম নিজেদের মতো করে

স্টান্ডার্ডাইজ করেছে সেটি কোনওভাবেই ইউনাইটেড নেশনস-নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন প্রক্রিয়ার সঙ্গে মানানসই নয়।

ভারতের ক্ষেত্রেই চীন প্রথমবার এরকম নাম পরিবর্তনের ঘটনা ঘটিয়েছে এমন নয়। নাম পরিবর্তন করে কূটনৈতিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া চীনের পুরানো কৌশল। যেমন দক্ষিণ চীন সাগরের বিতর্কিত এলাকার চীনা নামকরণ হলো জিশা আইল্যান্ড (Xisha Islands)। দক্ষিণ চীন সাগরের স্পের্টলি আইল্যান্ডের (Spratly Islands) চীনা নাম নানশা আইল্যান্ড (Nansha Island)। জাপানের সঙ্গে বিতর্কিত ডায়ও আইল্যান্ডস (Diaoyu Islands) কে চীন সেঙ্কাকু আইল্যান্ডস (Senkaku Islands) নাম দিয়েছে।

ভারতীয় মিডিয়ায় এই নাম পরিবর্তন নিয়ে হইচই হওয়ার পর চীনের সরকারি মুখপত্র গ্লোবাল টাইমস স্পষ্ট জানিয়েছে যে দলাই লামা নয়, দু'দেশের সীমা বিতর্কে চীনের অধিকার তুলে ধরাই এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য। ভারত চীন সীমান্তের দৈর্ঘ্য ৩ হাজার ৪৮৮ কিলোমিটার। ১৯৬২ সালের যুদ্ধে চীন ভারতের আকসাই চীন এলাকা দখল করে। চীনের এই জবরদখল থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়া ও অরুণাচল প্রদেশের উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চীনা সেনাবাহিনী যেখানে কোনো সীমান্ত বিতর্ক নেই সেই সমস্ত ভারতীয় এলাকায় বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যেই অনুপ্রবেশ করে, নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে দেয়।

উত্তরাখণ্ডের বারাহোতি এমন একটি এলাকা যেখানে প্রতি বছর জুলাই-আগস্ট মাসে চীনা সেনা নিয়মিত অনুপ্রবেশ করে থাকে। চীনের মতে এই এলাকাটিও বিতর্কিত। চীন ওদের ভাষায় এই এলাকার নাম রেখেছে হু জি। এই বারাহোতি এলাকা দিয়েই ম্যাকমোহন লাইন গিয়েছে। ২০০৭ থেকে ২০১৬-এর মধ্যে চীনা সেনা ৪০ বার এই বারাহোতি এলাকায় অনুপ্রবেশ করেছে।

ভারতের আপত্তি উড়িয়ে দিয়ে গিলগিট-বাল্টিস্তান এলাকা দিয়ে অবৈধ ভাবে নির্মিত ৪৬ বিলিয়ন ডলারের চীন-পাকিস্তান ইকোনোমিক করিডরকে বৈধ করার জন্য, চীনের মদতে পাকিস্তান পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট-বাল্টিস্তানকে পঞ্চম প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করার তোড়জোড় শুরু করেছে। এই ধরনের অবৈধ ক্রিয়াকলাপ থেকে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে জম্মু কাশ্মীরের অস্থিরতাকে চরমে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাকিস্তান জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটানো, পাথর ছোঁড়া, নাশকতায় মদত দেওয়ার মতো সবরকম অপকর্ম করছে। চীনা আপত্তিতে ভারত মাসুদ আজাহারের মতো সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না। চীনা আপত্তিতে ভারত এনএসজির সদস্যপদ পায়নি। চীন ভারতের বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীকেও মদত দিচ্ছে, এমন অভিযোগও আসছে।

বসে নেই ভারতও। ভারতের তরফেও ঢিলের জবাব পাটকেল দিয়ে দেওয়া শুরু হয়েছে। ২০১৬-র মে মাসে ভারত-ইরান-আফগানিস্তান চাবাহার নিয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়। পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত তথা জলসীমার খুব কাছে অবস্থিত চাবাহার বন্দরের আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেয় ভারত। এতে ভারত-ইরান-আফগানিস্তান অক্ষ আরও জোরদার হবে। পাক-অধিকৃত বালুচিস্তানে চীনা সহযোগিতায় পাকিস্তান যে গোয়াদর বন্দর গড়ে তুলছে, তারই জবাব এই চাবাহার বন্দর। এই বন্দর খুললে ভারত-আফগানিস্তান বাণিজ্য এবং পণ্য পরিবহণের পথে পাকিস্তান আর বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। শুধু তাই নয়, মধ্য এশিয়ার সমুদ্রেও ভারতের স্থায়ী ঘাঁটি তৈরি হয়ে যাবে। ওমান উপসাগরের মুখে ভারতের এই স্থায়ী ঘাঁটি চীনকে চাপে ফেলছে, বলছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা।

ভারত সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া-সহ চীন সাগরের আশেপাশে থাকা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করে চীনের জলসীমাকে সব দিক থেকে ঘিরে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে। ভারত-আমেরিকা-জাপান সামরিক অক্ষের নৌ-যুদ্ধের মহড়া আয়োজিত হচ্ছে চীনের নাকের ডগায়। বিশ্লেষকদের মতে, ভারত ভিয়েতনামের দক্ষিণ প্রান্তে নৌঘাঁটি বানিয়ে চীনকে সবচেয়ে বড় ধাক্কা দিয়েছে। ভারত মহাসাগরে ঢুকতে হলে চীনের পণ্যবাহী জাহাজ বা যুদ্ধজাহাজকে মালাক্কা প্রণালী হয়েই ঢুকতে হয়। ভিয়েতনামের জলসীমার গা দিয়েই গিয়েছে এই জলপথ। ভিয়েতনাম সরকারের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে ঠিক সেখানেই ভারতীয় নৌবাহিনী ঘাঁটি গেড়েছে। নৌবহরের আকার বাড়াতে বাড়াতে ভিয়েতনামের বন্দরে ভারতীয় নৌসেনার উপস্থিতি এখন এতটাই যে প্রয়োজনে ভিয়েতনামের জলসীমা ঘেঁষে চীনা জাহাজের যাতায়াত প্রায় অসম্ভব করে তুলতে পারে ভারত।

নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় এসে 'লুক ইস্ট' নীতি বদলে 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতি ঘোষণা করেছেন। এই নীতিতেই ভিয়েতনামের সেনাকে অত্যাধুনিক সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে দু'দেশের সম্পর্ককে আরও মজবুত করা হচ্ছে। ভিয়েতনামকে ভারত আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করছে। চীন সাগরের বুকে বা তার কাছাকাছি অবস্থিত যেসব দেশের সঙ্গে চীনের সুসম্পর্ক নেই, তাদের সঙ্গে ভারত প্রত্যক্ষ সামরিক জোট তৈরি করেছে। চীন সাগর ও ভারত মহাসাগরে অস্ট্রেলিয়া ও সিঙ্গাপুরের নৌবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে ভারতীয় নৌবাহিনী। যেকোনও সমস্যায় পরস্পরের সহায়তায় ছুটে আসার জন্য এই তিন দেশের নৌবাহিনী প্রস্তুত। ভারত মহাসাগরে চীনের প্রবেশপথে পাহারা বসিয়ে আর চীনের দক্ষিণে সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ-পশ্চিমে ভিয়েতনাম, আরও দক্ষিণে অস্ট্রেলিয়া এবং পূর্বে জাপানের সঙ্গে সামরিক জোট গড়ে চীনের জলসীমাকে ধীরে ধীরে সবদিক থেকে ঘিরে এক চক্রব্যূহ রচনা করেছে নয়াদিল্লি। ■

বিশেষ প্রতিবেদন

দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে রোহিঙ্গারা বিপজ্জনক

ধর্মানন্দ দেব

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি তারিখে আমাদের দেশে সংবিধান লাগু হয়। তখন সংবিধানের প্রস্তাবনায় স্পষ্ট বলা ছিল— ''we, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens...''। সংবিধানের মূল বা প্রাথমিক প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দ দুটি ছিল না। দেশে জরুরিকালীন সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৬ সালে ইন্দিরা গান্ধী সংবিধানের ৪২তম সংশোধন করে মুখবন্ধে 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দ দুটি জুড়ে দেন। সেই ৪২তম সংশোধনী বিল সংসদে পেশ করেন সাংসদ গোখলে। লোকসভায় পাশ হয় বিলটি ১৯৭৬ সালের ২ নভেম্বর, আর রাজ্যসভায় পাশ হয় ১১ নভেম্বর এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি মেলে ১৯৭৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর। পরে ১৯৭৭ সালের ৩ জানুয়ারি থেকে সেই সংশোধনী চালু হয়। একটা বিষয় পরিষ্কার যে, ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ২৬ বছর সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দ দুটি ছাড়া দেশ চলেছে। তখন সংবিধান নিয়ে দেশবাসীর কোনো সমস্যা হয়েছে বলে শোনা যায়নি। আর বর্তমান সংবিধানের কোথাও 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দের অর্থ সঠিকভাবে খুঁজে পাওয়া কঠিন। ভারতের সাংবিধানিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও ভারতের সমাজব্যবস্থা কিন্তু কখনই ধর্মনিরপেক্ষ নয়। অনেকে এমনও মনে করেন যে, ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণার মধ্য দিয়ে মূলত সাম্প্রদায়িকতারই তাস খেলেছিল তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। আর দেশের বর্তমান মোদী সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস-সহ দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির একমাত্র ও প্রধান বিষয় হয়েছে এই সাম্প্রদায়িকতা। এটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে জনসম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। রাজনৈতিক ইস্যুকেও ধর্মীয় ইস্যু বানাতেও তারা কার্পণ্যবোধ করেন না। এহেন রাজনীতি অনভিপ্রেত হলেও বর্তমান রাজনীতিতে নাকি সবকিছু 'সম্ভব'। কিন্তু তাই বলে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রশ্নেও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করা মোটেই কাম্য নয়। ভারতমাতার সন্তান হিসেবে সেটা মেনে নেওয়া যায় না। বর্তমানে রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে দেশের রাজনীতি সরগরম। মোদী সরকারের বিরোধীরা যেন কোনোভাবেই বুঝতে রাজি নয় যে রোহিঙ্গা সমস্যা আদৌ কোনো ধর্মীয় সমস্যা নয়।

২০১৭ সালের ২৯ আগস্ট সুপ্রিমকোর্টে দুই রোহিঙ্গা মুসলমান যথাক্রমে মোহম্মদ সেলিমুল্লা এবং মোহম্মদ শাকির একটি মামলা দাখিল করেন কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে। যার নম্বর রিট পিটিশন (সিভিল) ৭৯৩/২০১৭। ৮ সেপ্টম্বর, ২০১৭ মোহম্মদ সেলিমুল্লা এক শপথনামাও দাখিল করেন। জবাবে কেন্দ্র সরকারের পক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিদেশ যুগ্ম সচিব মুকেশ মিত্তাল ৩৬ প্যারাগ্রাফের এক শপথনামা দাখিল করে জানান, ভারতে বসবাসরত রোহিঙ্গারা কোনো উদ্বাস্তু নয়, তারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। এই রোহিঙ্গাদের সঙ্গে জঙ্গিযোগ থাকার কারণে তারা দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। তাই সরকার সংবিধান মেনেই রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে চায়। মোদী সরকারের এই সিদ্ধান্তকে 'অমানবিক' আখ্যা দিয়ে দেশের তথাকথিত সেকুলাররা গেল গেল রব শুরু করেছেন। তাৎক্ষণিক তিন তালাকে নিপীড়িত মুসলমান মহিলাদের উপর অমানবিক অত্যাচার যাঁদের চোখে পড়েনি, সেইসব তথাকথিত মুসলমান ধর্মগুরুরাও তাদের সঙ্গে তাল দিচ্ছেন। তারাই তীব্র বিরোধিতা করছেন ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পার্সি এবং শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষ অর্থাৎ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মানুষ নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন তাদের নাগরিকত্ব প্রদানে, আর আজ তারাই মানবাধিকার লঙ্ঘনের দোহাই তুলে রোহিঙ্গাদের জন্য মায়াকান্না করছেন এবং মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন।

রোহিঙ্গারা আসলে মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের একটি রাষ্ট্রবিহীন ইন্দো-আরিয়ান মুসলমান জনগোষ্ঠী। রাখাইন রাজ্যে আনুমানিক ১০ লক্ষ রোহিঙ্গার বাস ছিল। যদিও আজকের দিনে ওই রাজ্যে রোহিঙ্গার সংখ্যা হাতেগোনা। কেননা তাদের বেশিরভাগই বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। বহুদিন থেকেই মায়ানমার এটিই করতে চেয়েছিল, আর আজ তারা একশো শতাংশ সফল বলা যায়। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদদের মতে, ব্রিটিশ সরকার সেসময় পৃথক মুসলমান রাষ্ট্র গড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে রোহিঙ্গারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করে এবং পুরস্কার হিসেবে ব্রিটিশ সরকার রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন সরকারি পদে নিযুক্ত করে। পরে ১৯৪৮

সাল মায়ানমার স্বাধীন হওয়ার পর সরকারের কাছে রোহিঙ্গারা স্বশাসিত মুসলমান রাষ্ট্র দাবি করলে সরকার নাকচ করে দেয় এবং ১৯৪৮ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুসারে রোহিঙ্গারা বিদেশি। অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন ওই নাগরিকত্ব আইনের কিছু বিশেষ ধারা এবং শর্ত অনুসারে অল্পসংখ্যক রোহিঙ্গাকে তখন নাগরিকত্বও প্রদান করে মায়ানমার সরকার। তাই বিভিন্ন সময়ে মায়ানমারে দুই মহিলা-সহ ১৭ জন রোহিঙ্গা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। একজন স্বাস্থ্যমন্ত্রীও হয়েছিলেন। সরকারের সচিব-সহ শীর্ষ পদেও আসীন ছিল রোহিঙ্গারা। ১৯৯০ সালের নির্বাচনেও পার্লামেন্টে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানের চারজন প্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে যারা নাগরিকত্ব পাননি তারাই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। ১৯৬২ সালের ২ মার্চ মায়ানমারের সামরিক জুন্টা ক্ষমতা দখল করে এবং তখন থেকেই শুরু হয় রোহিঙ্গাদের (যাদের নাগরিকত্ব নেই) দুর্বিষহ জীবন। কেননা প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের দেশে সেনাবাহিনীর সংখ্যা প্রায় ছয় লাখ, যা জনসংখ্যার অনুপাতে বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। শুধু তাই নয়, ১৯৭০ সালে মায়ানমারে ইমারজেন্সি ইমিগ্রেশন আইন পাশ করে রোহিঙ্গাদের ওই দেশে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আর তখন থেকেই রোহিঙ্গারা সেনাবাহিনীর নির্যাতন পেয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে শুরু করে। আবার ১৯৮২ সালে মায়ানমারে নাগরিকত্ব আইন অনুসারে ১৮২৩ সালের আগে থেকে যারা বংশানুক্রমে সে দেশে বসবাস করছে একমাত্র তারাই মায়ানমারের বৈধ নাগরিক। তাই রোহিঙ্গারা সরকারি অনুমতি ব্যতিরেক ভ্রমণ করতে পারবে না এবং পূর্বে তাদের দুই সন্তানের বেশি শিশু না থাকার প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করতে হতো, যদিও এই নিয়ম বাস্তবে তেমন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়নি বলে জানা যায়। জন্ম নিবন্ধন, বিয়ে, জমির দলিলপত্র, নাগরিকত্বসহ বিভিন্ন মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত করে রাখা হয়। মায়ানমারের সামরিক জুন্টা ১৯৯০ সালের ২৭ মে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে। ওই নির্বাচনে আং সান সু চি-র দল 'ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি' ৪৯২টি আসনের মধ্যে ৩৯২টি আসন দখল করে। অর্থাৎ প্রায় ৮১ শতাংশ আসন পায় কিন্তু সেনাবাহিনী ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানায়, যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হৈচৈ ফেলে দেয়। বর্তমানে মায়ানমারে তার দল ক্ষমতায়। স্বামী ও সন্তানরা বিদেশি নাগরিক হওয়ায় সংবিধান অনুসারে তিনি রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না, তাই নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা পদটি গ্রহণ করেন যা প্রধানমন্ত্রী বা সরকার প্রধানের সমান।

২০১২ সালে রোহিঙ্গাদের উপর সেনাবাহিনীর অত্যাচারের মাত্র চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। কেননা ওই সময় দুজন রোহিঙ্গা একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলাকে প্রথমে ধর্ষণ এবং পরে খুন করে। তাই ওই সময় বৌদ্ধ ও রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জাতিগত দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। তেমনি ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ও মায়ানমার সীমান্তে পুলিশ ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে ন'জন পুলিশকে হত্যা করে রোহিঙ্গাদের 'আরসা' আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি। তখন মায়ানমারের সেনাবাহিনী বাধ্য হয়ে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে 'ক্লিয়ারেন্স অপারেশন' শুরু করে। এই অপারেশনে অনেক রোহিঙ্গা নিহত এবং আহত হন। অনেকের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। রোহিঙ্গারা সেনাবাহিনীর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে বেশিরভাগই বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় এবং একাংশ ভারতে এসে আশ্রয় নেয়। সরকারি তথ্য মতে সেই সংখ্যা হবে ভারতে ৪০ হাজার। যার মধ্যে প্রায় ১৬,৫০০ জনের কাছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দেওয়া শরণার্থী পরিচয়পত্র আছে। বাকিরা ভারতে এখন 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী' হিসেবেই রয়েছেন। মোদী সরকার এইসব অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করে মায়ানমারে ফেরত পাঠাতে চায়। কারণ তাদের বিভিন্ন এজেন্ট মারফত টাকার বিনিময়ে ভারতে পাচার করা হয়েছে। যাদের সঙ্গে আলকায়দা, তালিবান, পাকিস্তানি জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে বলে ভারতের বিভিন্ন তদন্ত সংস্থার কাছে খবর রয়েছে। তার প্রমাণ হচ্ছে হাফিজ সইদের মতো সন্ত্রাসবাদীরা প্রকাশ্যে রোহিঙ্গাদের হয়ে মোদী সরকারকে হুমকি প্রদান। এছাড়াও অতি সম্প্রতি হায়দরাবাদেও একজন রোহিঙ্গা সন্ত্রাসবাদী এনআইএ-র হাতে ধরা পড়েছে এবং তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের এক পৌরসভার দেওয়া ভুয়ো পরিচয়পত্রও।

অথচ আর আমাদের দেশের তথাকথিত সেকুলার রাজনৈতিক নেতারাও বলছেন ভারতের মানবিক মুখ বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে মানবিক হওয়ার চেয়ে অমানবিকতাই ভাল। তাই বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গারা সীমান্ত পেরিয়ে কোনো অবস্থায়ই যাতে ভারতে ঢুকতে না পারে তার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। বিশেষ করে অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা সীমান্তে কড়া নজরদারি রাখতে হবে ভারত সরকারকে। সঙ্গে প্রয়োজন দেশে থাকা রোহিঙ্গা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন। কারণ দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্বার্থে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গারা বিপজ্জনক।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

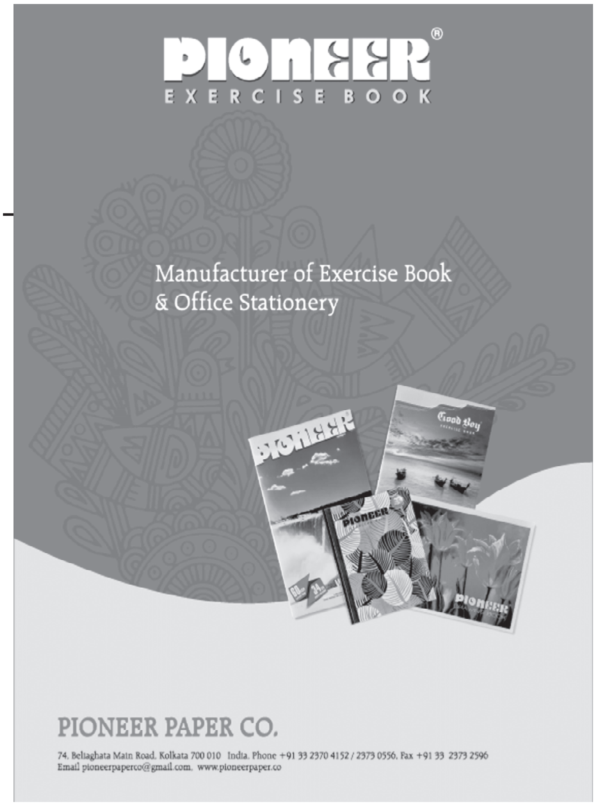

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

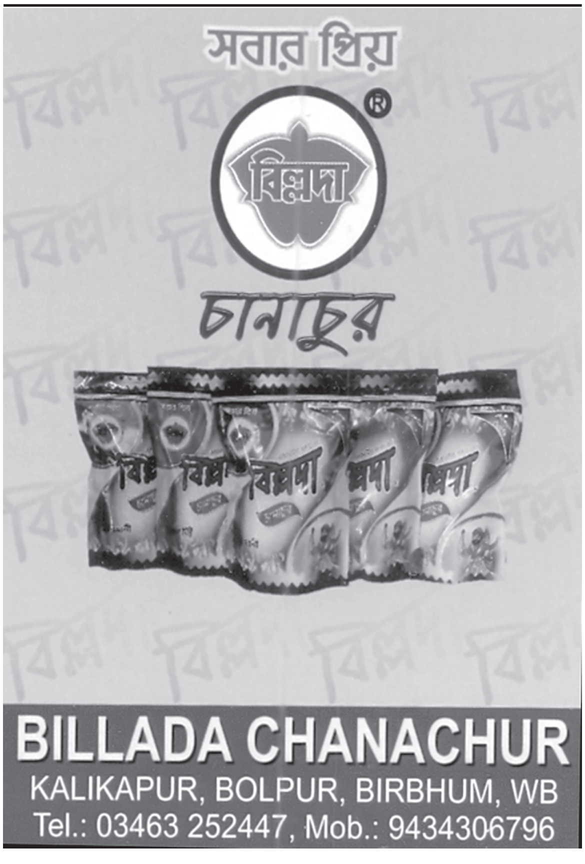

ডেঙ্গুর প্রাথমিক লক্ষণ

- প্রবল জ্বর।
- প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা।
- চোখের পিছন দিকে ব্যথা।
- অস্থিসন্ধির যন্ত্রণা।
- পেশি এবং হাড়ের যন্ত্রণা।
- র‍্যাশ।
- নাক এবং মাড়িতে রক্তক্ষরণ।
- শ্বেত রক্তকণিকা কমে যাওয়া।

ডেঙ্গু নিয়ে রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গে ডেঙ্গুতে এখনও পর্যন্ত কতজন মারা গেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর কেউ জানেন না। গত মাসের শেষের দিকে রাজ্যের মুখ্য সচিব জানিয়েছিলেন মৃতের সংখ্যা ৩৫। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এ বছরে পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত ডেঙ্গুরোগীর সংখ্যা ১৮,২৩৮। তার মধ্যে ৩৫ জন মারা গেছেন। খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীরা মহামারী ঘোষণা করার দাবি তুললেন। প্যাঁচে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী মৃতের সংখ্যা কমিয়ে বললেন ১৩। তাঁর বক্তব্য, 'ওরা সবাই ষড়যন্ত্রকারী। সরকারের বদনাম করতে চায়।' প্রশ্ন হলো শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যাবে?

'মশা কি আমরা আমদানি করেছি? মশা এসেছে আশপাশের রাজ্য থেকে...ভুটান থেকে, বাংলাদেশ থেকে। মশারা রুট বদল করে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে পড়েছে।'

—মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রী।

'ওরা (বিরোধীরা) যতটা বলছে ততটা উদ্বেগের কিছু নেই। ডেঙ্গুর ব্যাপারে রাজ্য সরকার সচেষ্ট রয়েছে। সরকার তো কাজ করছে। কাজ করতে গেলে কিছু ভুলভ্রান্তি হতেই পারে।'

—পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষামন্ত্রী।

একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় খুবই জরুরি। এপিডেমিক বা এন্ডেমিক হলে আগেভাগে সতর্ক করাও সমান জরুরি। সরকার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে কিনা সে ব্যাপারে আমি কোনও মন্তব্য করব না। শুধু এইটুকু বলতে চাই, রোগ নির্ণয় ঠিকমতো হলে শুধু ডেঙ্গু কেন, যে কোনও অসুখেই অকালমৃত্যু অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব।

—ডাঃ দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে পাবলিক হেল্‌থ সিস্টেম একেবারে ভেঙে পড়েছে। ডেঙ্গু প্রসঙ্গে বলা যায়, রোগ নির্ণয় ঠিকমতো হচ্ছে না। যে কোনও জ্বরই ডেঙ্গু নয়। ডেঙ্গুর মধ্যেও মাত্র এক শতাংশ বিপজ্জনক। যাকে চিকিৎসা পরিভাষায় বলে, হেমারেজিক ডেঙ্গু। অথচ গ্রামেগঞ্জে (এমনকী শহরেও) ঠিকমতো রোগ নির্ণয় না করে চিকিৎসা করার ফলে রোগী সহজেই কাহিল হয়ে পড়ছে।

—ডাঃ নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথমেই বলব কী অসুখ হয়েছে রোগীকে সেটা জানানো দরকার। ডেঙ্গু সংক্রান্ত তথ্য কোনওভাবেই সরকারের ধামাচাপা দেওয়া উচিত নয়। আমি চাঁচলে থাকি। এখানে বহু লোকের ডেঙ্গু হয়েছে। ৭-৮ জন মারাও গেছেন। অথচ মানুষকে ধোঁয়াশার মধ্যে রাখা হচ্ছে। এটা ঠিক নয়।

—ডাঃ দেবাশিস রায়চৌধুরি

ডেঙ্গু নিয়ে মারাত্মক ব্যাপার চলছে। একে মহামারী বলা হলে অতিশয়োক্তি করা হবে না। আমার মনে হয় রোগনির্ণয় ঠিকমতো হচ্ছে না। ভুল চিকিৎসায় মানুষ মারা যাচ্ছেন।

—ডাঃ আশিস মিত্র

ডেঙ্গু নিয়ে রাজনীতি বলি হচ্ছেন সাধারণ মানুষ

পার্থ চৌধুরী

'ডেঙ্গু' পশ্চিমবঙ্গে এখন আতঙ্ক। গ্রামে, শহরে সবার মুখে মুখে ফেরা একটি ভয়াবহ নাম। ডেঙ্গু এক প্রকারের জ্বর যা ছড়িয়ে পড়ে মশার কামড়ের দ্বারা। ডেঙ্গু ভাইরাস থেকে এই জ্বরের সৃষ্টি। সাধারণ জ্বরের চার থেকে চোদ্দো দিনের মধ্যে এর ভাইরাস আক্রমণ করে। উপসর্গ— প্রবল জ্বর, মাথা ব্যথা, বমি, পেশী ও গাঁটে ব্যথা এবং চামড়ায় র‍্যাশ। এই জ্বরের প্রভাবে প্লেটলেটের মাত্রা ক্রমে নামতে থাকে এবং যথাসময়ে তা আটকাতে না পারলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। রোগীর নাক দিয়ে রক্তপাত, মাড়ি থেকে রক্তপাত, Skin hormonhoges. এছাড়াও Internal Bleeding-ও হতে পারে। ডেঙ্গু ভাইরাস থেকে চার প্রকারের জ্বর হতে পারে (Dengue Virus Tapes 1-4 or DENV 1-4)। Aedes Aegypti হলো ডেঙ্গু বাহিত মশা।

এখন এই ডেঙ্গুর প্রকোপে সারা বাংলা জর্জরিত। ডেঙ্গু রোধে সঠিক ব্যবস্থা না করতে পারলে পুরবোর্ড ভেঙে ফেলার হুমকি দেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করার পরেও বেশ কয়েকটি পুরসভা ডেঙ্গু মোকাবিলায় কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে— তা খোদ মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। টাকা নিয়ে পুরসভাগুলি কাজ না করায় তিনি বোর্ড ভেঙে ফেলার হুমকি দিতে বাধ্য হয়েছেন। রাজ্যের মানুষ জানে এসব কিছুই হবে না। মাঝখান থেকে সাধারণ মানুষ বলি হবে ডেঙ্গুতে।

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিভিন্ন জেলায় প্রতিদিন বহু মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছেন। দক্ষিণবঙ্গে কলকাতা ও লাগোয়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এই রোগের দাপট ভয়াবহ। ডায়মন্ডহারবার দক্ষিণ পুরসভা গ্রামীণ এলাকা ছাড়াও ভাঙড় ও কাশীপুর এলাকায় ডেঙ্গুর উপদ্রব বেড়েছে। বহু মানুষকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তাদের বড় অংশই শিশু। পরিসংখ্যান বলছে, রাজ্য ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা ২২ হাজারেরও বেশি।

কলকাতা ও শহরতলি-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও রাজ্যের প্রশাসন যথেষ্ট তৎপর নয়। উলটে রোগাক্রান্তের সংখ্যা গোপন করার প্রচেষ্টাই বেশি চলছে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন মামুলি বিষয়ে যেভাবে মানুষের পাশে থাকতেন, এখন সেই মানবিক চরিত্র হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। তাঁর হাতে থাকা স্বাস্থ্যদপ্তর তাঁরই নির্দেশে ডেঙ্গু মোকাবিলার চেয়ে তথ্য গোপনে বেশি সক্রিয়। চিকিৎসক সমাজকে ভয় দেখানো হচ্ছে। শুধু প্রশাসনিক স্তরে নয়, শাসক দলের কর্মীরাও স্থানীয় ভাবে চিকিৎসক ও ল্যাবরেটরিগুলিকে হুমকি দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। জরুরি ভিত্তিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব অনিল ভার্মা, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ বিশ্বরঞ্জন শতপথী-সহ অন্যান্যদের জানিয়ে দেন জরুরি বিভাগের শূন্যপদ পূরণ করতে হবে। প্রায় ১৫২৮টি শূন্যপদ রয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগে।

এখন প্রশ্ন হলো, এতদিন এই শূন্যপদ নিয়ে ভাবা হয়নি কেন? কবে এই শূন্যপদ পূরণ হবে, তারপর ডেঙ্গু মোকাবিলা হবে। মাঝখান থেকে সাধারণ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। কিছু নার্সিংহোম মৃত রোগীর ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডেঙ্গু

চিহ্নিত করার পর নার্সিংহোমগুলির লাইসেন্স পর্যন্ত বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

ডেঙ্গু মোকাবিলায় কলকাতা পুরসভার দুই বিভাগের সমন্বয়ের অভাব ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠেছে। ডেঙ্গু বাহক মশা এডিস ইজিপ্টাইয়ের জন্ম ও বংশবিস্তার রুখতে এই দুটি বিভাগের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পুরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগের একাধিক আধিকারিক থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিকদের একাংশ মনে করছেন, এই দুটি বিভাগের সমন্বয়ের অভাবে শহরের বিভিন্ন এলাকায় মশানিধন কর্মসূচি ব্যাহত হচ্ছে। সেই কারণে কয়েকদিন আগে রাজ্য সরকারের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করে কোনও সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আবাসন ইত্যাদি 'সংরক্ষিত' জায়গার ভিতরের আবর্জনা পুরসভাকেই পরিষ্কার করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

পুরসভার নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন সকালে শহরের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাফাইকর্মীরা আবর্জনা সংগ্রহ করেন। কোথাও কারও ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পেলে পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা সেই এলাকায় এরিয়া ফলিংসহ সাফাই, জীবাণুনাশক তেল ছড়ানোর মতো কাজগুলি করে দিয়ে আসেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু জায়গায় ময়লা, আবর্জনা পড়ে থাকলেও তা সাফ করার মতো পরিকাঠামো পুরস্বাস্থ্য বিভাগের হাতে নেই। কিন্তু মশার বংশবিস্তার রোধে সেই জায়গা পরিষ্কার রাখা জরুরি। সেক্ষেত্রে ওই এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মীদের খবর দিতে হয়। এই কাজ করতে গিয়ে সমন্বয়ের কোনও ফাঁক থেকে গেলে জঞ্জাল পড়েই থাকে। এমন অভিযোগ পুরসভার গত মাসিক অধিবেশনে একাধিক বিরোধী কাউন্সিলারাও করেছেন। এসবের প্রেক্ষিতেই রাজ্য সরকারের ওই নির্দেশিকা বলে মনে করা হচ্ছে। আবাসন, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, তাদের এলাকার বর্জ্য তাদের দায়িত্বেই পুরসভার গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে। এই কাজ যদি ঠিক ভাবে সংস্থাগুলি না করে তাহলে বর্তমান পরিস্থিতিতে ডেঙ্গু ঠেকাতে তা পুরসভাকেই করে দিতে হবে। যদিও কর্মীর অভাবে জঞ্জাল অপসারণ বিভাগ এই বাড়তি দায়িত্ব কতটা সামলে উঠতে পারবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে পুরসভার অন্দরেই।

অন্যদিকে, ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীরা যথাসময়ে রক্ত পাচ্ছে না। বেসরকারি-সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের জোগান নেই। রোগীর আত্মীয়েরা ব্লাডব্যাঙ্কে গিয়ে খালি হাতে ফিরে আসছেন আর প্লেটলেটের অভাবে রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কগুলি পর্যাপ্ত রক্ত মজুত রাখতেও ব্যর্থ হচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার এই বেহাল দশা ও ডেঙ্গু চিকিৎসার সঠিক পরিকাঠামোর অভাবে ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে দিনকে দিন। একই সঙ্গে মশা নিধনে পুরসভার ব্যর্থতা ও ডেঙ্গু মশা বংশবিস্তারের পরিবেশকে নষ্ট করে দেওয়া এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতা বার্তা পৌঁছে দেওয়াতে রাজ্য সরকার চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে।

এই রকমের মারণ রোগকে আটকানোর জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উচিত, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির পরামর্শ নেওয়া। সংবাদমাধ্যমের দ্বারা ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনার এক বাতাবরণ তৈরি করা। বিভিন্ন এনজিও এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে ডেঙ্গু নিয়ে কাজ করতে উৎসাহ প্রদান করা। পুরসভা ও রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয় তৈরি করা, ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্ত মজুত রাখা, সরকারি অ্যাম্বুলেন্সগুলি ডেঙ্গু মোকাবিলায় নামানো। এই প্রকারের দরকারি পদক্ষেপগুলি না করে মুখ্যমন্ত্রী ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা ও মৃত্যুর সংখ্যা গোপন করাতেই তৎপর রয়েছেন।

পুরসভা ও রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয় তৈরি করা, ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্ত মজুত রাখা, সরকারি অ্যাম্বুলেন্সগুলি ডেঙ্গু মোকাবিলায় নামানো। এই প্রকারের দরকারি পদক্ষেপগুলি না করে মুখ্যমন্ত্রী ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা ও মৃত্যুর সংখ্যা গোপন করাতেই তৎপর রয়েছেন।

ডেঙ্গুর আতঙ্ক এমনই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যে, যেসব বিদেশি পর্যটক কলকাতা-সহ বাংলার নানা স্থানে এসেছেন তাঁরা সবাই ডেঙ্গুর ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পালাতে ব্যস্ত। ■

ডেঙ্গুতে মৃত্যুর মিছিল
দায় কার ?

ডাঃ সুভাষ সরকার

রাজ্যে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর মিছিল অব্যাহত। রাজ্য সরকারের কোনো আক্ষেপ তো নেই-ই, বরং দায়ভার কাঁধ থেকে কাঁধান্তরে পাঠাতে পাঠাতে এখন জনতার ওপরে ফেলেছে। অন্য প্রদেশে ভ্রমণ করে পশ্চিমবাংলার মানুষ নাকি ডেঙ্গুর ভাইরাসবাহিত মশা ব্যাগে করে অথবা নিজে ডেঙ্গুবাহিত মশার কামড় খেয়ে নিজের রক্তে ডেঙ্গু ভাইরাস এনে পশ্চিমবাংলায় ছড়িয়ে দিয়েছেন—কল্পনার বাহাদুরি বটে! অন্য প্রদেশে বেড়াতে গিয়ে, ফিরে এসে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অবশেষে মৃত্যুবরণ করেছে—এমন সংবাদ তো পশ্চিমবঙ্গের মানুষের শ্রুতিগোচর হয়নি।

রাজ্যের জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার সম্পূর্ণ দায় রাজ্য সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকার ভুরি ভুরি অর্থ দেয় এনএইচএম (ন্যাশনাল হেলথ্ মিশন)-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে। রাজ্যের জনগণ শুনলে অবাক হবেন, মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোটি কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। সেই টাকায় না জানি কোন উৎসব হয়েছে বা ব্যয় করতে ভুলে গেছে। দেড় মাসের মধ্যে পরিস্থিতি রাজ্য সরকারের উদাসীনতায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

প্রথম এই বছর দুর্গাপূজার অব্যবহিত পরই দেখা গেছে শিলিগুড়ি, দেগঙ্গা, হাবড়া, বারাসাত, সল্টলেক ও দমদমে জ্বরের রোগীর সংখ্যা ও ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কল্পনাতীত ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবাদপত্রে প্রতিদিন জনসাধারণ এবং রাজ্য সরকার জানতে পারছে সংক্রামিত রোগের পরিসংখ্যান রাখা রাজ্য সরকারের দায়। অথচ জেলায় জেলায় স্বাস্থ্য অধিকর্তা (সিএমওএইচ)-এর কাছে নির্দেশ গেল না যে আপনার জেলায় প্রত্যেক সরকারি বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসকদের তা জানান এবং সপ্তাহে দু' বার জ্বরে আক্রান্ত রোগীর তথ্য দিন।

নির্দিষ্ট এলাকা ও নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি বছরে তার আগের বছরের তুলনায় ৫০ শতাংশ রোগী বেশি হলেই সেই এলাকায় রোগটি মহামারীর আকার নিয়েছে ঘোষণা করা বাঞ্ছনীয়। অথচ এবারে রোগীর সংখ্যা অন্তত ২৫০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ গত বছরে আক্রান্ত এলাকায় এই দুই মাসে যদি ২ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে থাকে এবছরে ৩ জন আক্রান্ত হলেই ওই এলাকায় মহামারী হয়েছে বলতে হবে কিন্তু ৩-এর পরিবর্তে অন্তত ৭-এর বেশি আক্রান্ত হয়েছে। রাজ্য সরকার মান বাঁচাতে তথ্য সংগ্রহ না করে বরং তথ্য গোপন করতে ব্যস্ত।

১১ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে জানা যাচ্ছে ডাঃ অরুণাচল দত্তচৌধুরী বারাসাত হাসপাতালের একদিনের স্বাস্থ্যব্যবস্থার নমুনা 'ফেসবুক'-এ পোস্ট করার দায়ে সাসপেন্ড হয়েছেন। নমুনাটি কী— ২৪০ জন রোগীর জন্য ডাক্তার ১ জন, নার্স ৩ জন, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী ১ জন ও সাফাই কর্মী ১ জন। ডেঙ্গু রোগ নির্ণয়ে ও চিকিৎসায় প্যাথলজিক্যাল ল্যাবোরেটরির ভূমিকা অপরিসীম। নিয়মিত প্লেটলেট গণনা ও হিমাটোক্রিটের মান নির্ণয় ও তার সত্বর বিধান ব্যবস্থা রোগের জটিলতা ও জটিলতার কারণে মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে অনেকটাই সক্ষম হতে পারে। জ্বরের চারদিন পর থেকে ডেঙ্গু এলিসা আই জি এম (Elisa IGM) পরীক্ষার ব্যবস্থা করে ও চিকিৎসা ব্যবস্থা আরও নিপুণ করা যেতে পারত।

বারাসাতের মতো জেলা হাসপাতালেও ডেঙ্গু আই জি এম নির্ণয় এবং ভর্তি রোগীদের রক্ত পরীক্ষা নিয়মিত করার ব্যবস্থা নেই। আউটডোরে রোগীদের রক্ত পরীক্ষার সুযোগ তো অনেক দূর। মানুষের রোষ বাড়তে শুরু করেছে। ৪ নভেম্বর দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মণ্ডল যখন স্থানীয় ডেঙ্গুতে মৃত কাহারপাড়ার সীমা কাহারের বাড়ি যান গ্রামবাসীরা একসঙ্গে বলেন, 'আমাদের সান্তনা দরকার নেই। ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।'

রাজ্য সরকারের কাজের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল :

(১) সারা বছর ধরে মশা নিয়ন্ত্রণের প্রকল্পের কার্যকরী রূপ দেওয়া। সরকার কী করছে নমুনা দেখতে চান তো--- Google.com.-এ NVBDCP fund 2015 অথবা 15-16 NVBDCP-তে ক্লিক করলেই Vector control fund-এ ওয়েস্ট বেঙ্গলের ঘরে দেখতে পাবেন ২০০০ লক্ষ বা ২০ কোটি বরাদ্দ হয়েছে এবং আগের বছর অর্থাৎ ২০১৪-১৫-তে পূর্বের টাকা যে খরচই করতে পারেনি তাও লেখা আছে।

(২) সমস্ত শক্তি দিয়ে আক্রান্ত রোগী ও সেই এলাকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি করা গ্রহণ করা উচিত ছিল।

রাজ্য সরকার যা করতে পারত :

পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের মানুষ অত্যন্ত সদর্থক আবেগপ্রবণ। যে কোনো দুর্দিনে জনতার সহযোগিতায় সবরকম দুর্যোগের মোকাবিলা সহজেই সম্ভব।

(১) জ্বরে আক্রান্ত অত্যধিক রোগীর এলাকা যেমন— বারাসাত, হাওড়া, দেগঙ্গার হাসপাতালগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের অন্য হাসপাতাল থেকে ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্যাল স্টাফ, প্যাথোলজির ডাক্তার, টেকনিসিয়ান ডেপুটেশন পোস্টিংয়ে পাঠানো উচিত ছিল। সঙ্গে অবশ্যই অতিরিক্ত স্টেথোস্‌কোপ, রক্তচাপ মাপার যন্ত্র, প্যাথোলজিক্যাল যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক জিনিসপত্র থাকাও দরকার।

(২) বেসরকারি চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং এমনকী গ্রামের চিকিৎসা সহায়কদের নিয়ে দ্বি-স্তরীয় ওয়ার্কশপ করা যেতে পারতো। সমাজের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী সরকারি কর্মী (আশা, অঙ্গনওয়াড়ি), ক্লাবের সমাজসেবী সদস্য, ইচ্ছুক সেলফ্ হেল্প গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে ও পৃথক ১টি ওয়ার্কশপ করে জ্বর নিরীক্ষণ করা উচিত ছিল।

(৩) আউটডোরে ৭০ জন রোগী পিছু একজন ডাক্তার নিযুক্তির ব্যবস্থা করতে হতো। প্যাথোলসিস্ট হাবড়াতে অন্তত অতিরিক্ত চারজন, দেগঙ্গাতে ২ জন এবং বারাসতেও অন্তত ৪ জন নিযুক্ত করা উচিত ছিল। ■

ডেঙ্গু নিয়ে রাজ্যসরকারের ওপর আস্থা না রেখে নিজেদেরই ব্যবস্থা নিতে হবে

ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে ডেঙ্গি জ্বরের অতিরিক্ত প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। বেসরকারি সংবাদমাধ্যম সূত্রে গত ৩ মাসে প্রায় ১৫০-এর বেশি মৃত্যু ঘটেছে ডেঙ্গি জ্বরে। সরকারি মতে কতজন আক্রান্ত সরকার নিজেও জানে না। উত্তর কলকাতার দমদম হোক বা দক্ষিণের বেহালা, উত্তর ২৪ পরগনায় বসিরহাট হোক বা দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর, মশাবাহিত ভাইরাসঘটিত ডেঙ্গি রোগে গ্রামে আজ শত শত মানুষ আক্রান্ত, এই জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করাই হবে রাজধর্ম পালন। কিন্তু রাজ্যের পৌরসভা বা পঞ্চায়েতের গাফিলতি ঢাকতে চিকিৎসাশাস্ত্রে অল্পজ্ঞানযুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য দিয়ে চলেছেন। কখনও বলে বসলেন বিজেপিশাসিত ভিনরাজ্য থেকে মশা এসে ডেঙ্গি ঘটাচ্ছে, কখনও বলে বসলেন কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসে ডেঙ্গি মশার চাষ হচ্ছে, কখনও বললেন এসব বেসরকারি ল্যাবেরেটরির চক্রান্ত, বা কখনো নিজের সরকারের মুখ্যসচিবের দেওয়া ডেঙ্গিতে মৃত্যুর পরিসংখ্যান নিজেই খণ্ডন করে একলাফে ৩৫ থেকে ১৩ করে দিলেন।

ডেঙ্গি কি কোনও গুপ্তরোগ? এভাবে তথ্য গোপন করে আখেরে ক্ষতি কার হচ্ছে। অবশ্যই মানুষের। অধিকাংশ ডাক্তার বা প্যাথোলজি ল্যাব দিদিমণির রোষে পড়ার ভয়ে ডেঙ্গি লিখতে ভয় পাচ্ছে। তৃণমূল রানির মর্জিতে রাজ্য চললেও বিজ্ঞান চলে না। এই ভয়ের পরিবেশে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে কি সঠিক চিকিৎসা পাওয়া সম্ভব আপামর জনসাধারণের? এরকম পরিস্থিতিতে সরকারের উপর আস্থা না রেখে নিজেদেরই আজ ব্যবস্থা নিতে হবে মহামারী রোধের এই যুদ্ধে। ডেঙ্গি রোগের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খাওয়া এবং জ্বর বা ব্যথা দমনে প্যারাসিটামল খাওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু করার থাকে না। তাই এই রোগ চিকিৎসার চেয়ে এই রোগকে প্রতিরোধ করাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায়। ব্যক্তিগত স্তরে কিছু ভালো অভ্যাস যেমন নিয়মিত মশারি টাঙানো বা Full Sleeve Shirt বা প্যান্ট পরে থেকে জানালা দরজা বন্ধ রাখলে ডেঙ্গির বাহক Aedes বা বাঘ মশার কামড় থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়।

ডেঙ্গি রুখতে কী কী করবেন?

ডেঙ্গি একটি মশাবাহিত রোগ। সুতরাং মশার কামড় রোধ করাই প্রথম কাজ।

- অবশ্যই মশারি টাঙিয়ে ঘুমাবেন।
- বাড়ির মধ্যে বা নিজের কর্মস্থলে বা বাড়ির আশেপাশে কোথাও জল জমতে দেবেন না।
- ঘরে বা কর্মস্থলে গুডনাইট/অল আউট/ মর্টিন জ্বালিয়ে রাখবেন।
- ঘরের দরজা জানালা অধিকাংশ সময় বন্ধ রাখবেন।
- ফুলহাতা জামাপ্যান্ট/ কাপড় পরবেন যাতে হাত পা অধিকাংশ ঢাকা থাকে।
- খাটের তলা বা বাড়ির পাশের নর্দমায় হিট বা অন্যান্য মশানাশক স্প্রে ব্যবহার করুন।

কীভাবে ছড়ায় : ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তিকে যদি কোনো স্ত্রী এডিস মশা কামড়ায় বা হুল ফোটায়, ভাইরাস তখন মানবদেহ থেকে মশাটির মধ্যে যায়। এরপর মশাটি যখন কোনো সুস্থ লোককে কামড়াবে, সুস্থ লোকটিও ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হবে।

উপসর্গ এবং রোগ লক্ষণ : ডেঙ্গু দু'রকম।

(১) **স্বাভাবিক ডেঙ্গু :** হঠাৎ করে জ্বর আসে, মাথাব্যথা, জ্বরের একদিনের মধ্যে গায়ে মাথায়, হাত-পা মাংসপেশীতে ব্যথা থাকে। সারা শরীরে র‍্যাশ বেরোয়, বমি ও কাঁপুনি থাকে।

(২) **ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভার :** জ্বর শুরু হবার ২-৫ দিনের মধ্যে রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। দুর্বল, অস্থিরতা ও ইউরিন কমে যায়, পেট ফুলে যায়, ডায়ারিয়া হয়।

প্রতিরোধ চিকিৎসা :

(১) অযথা আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে হাসপাতালে ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ খেতে হবে।

(২) প্রচুর পরিমাণে জল, ডাবের জল, ওআরএস পান করুন।

ঘরোয়া টোটকা : পেঁপে পাতার রসে পেপিন থাকে যা ডেঙ্গু প্রতিরোধে সহায়তা করে ও প্লেটলেটস বাড়াতে সাহায্য করে। বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন। ড্রেনগুলোতে ডিডিটি স্প্রে করুন। বাড়ির চারপাশে কোনো পুরনো টায়ার-টিউবে জল জমতে দেবেন না। মশারি ব্যবহার করুন। ■

এই সময়

নবমবর্ষীয়া

মোবাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে ন' বছরের সুজান পেয়ে গিয়েছিল বাবার পে-পল অ্যাকাউন্টের

পাসওয়ার্ডের হদিশ। তারপরেই সে হাজার পাউন্ড খরচ করে ডিজনিল্যান্ডে একটা ট্রিপ বুক করে। তিনদিন পর বাবা, ইয়ান উইলসন জানতে পারেন। ঘটনাটি ইংল্যান্ডের।

ড্রামা কুইন

কাছের একটি বাড়ি থেকে ক্রমাগত 'হেল্প হেল্প' চিৎকার শুনে ড্রাইভার লি পার্ডি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তার মনে

হয়েছিল কোনও মহিলা সাহায্য চাইছেন। শেষে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে পুলিশের হেল্পলাইনে ফোন করেন। পুলিশ গিয়ে দেখে সাহায্যপ্রার্থিনী কোনও মহিলা নন, একটি টিয়া। আমেরিকার ওরেগাও-র ঘটনা।

কফি খেয়ে বেহুঁশ

'কফি খেলে নার্ভ চাঙ্গা হয়', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কর্নেল নীলাদ্রি সরকার এমনটাই বলে থাকেন। কিন্তু সম্প্রতি কফি খেয়ে ব্যাঙ্ককের চিড়িয়াখানার একটি বাঁদর অজ্ঞান

হয়ে গিয়েছিল। এক দর্শককে কফি খেতে দেখে তাকে নকল করতে গিয়েছিল সে।

সমাবেশ -সমাচার

কর্ণমাধবপুর বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্রের বিজয়া ও দীপাবলী সম্মেলন উপলক্ষে শীতবস্ত্র প্রদান

কর্ণমাধবপুর বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে গত ২৯ অক্টোবর সেবাকেন্দ্র প্রাঙ্গণে বিজয়া ও দীপাবলী সম্মেলন উপলক্ষে এলাকার ১০০ জন দুঃস্থ মানুষজনের হাতে শীতের চাদর, সোয়েটার, মাফলার তুলে দেওয়া হয়।

এদিনে পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ তরুণ সরকার। বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন নবদ্বীপের গীতা প্রচার সঙ্ঘের প্রধান মহন্ত কেশবপুরী মহারাজ। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক-শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী ড. কল্যাণ চক্রবর্তী। সভাপতি তরুণবাবু তাঁর ভাষণে জানান তিনি এই সমাজ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে গর্বিত। তিনি সবাইকে সমাজ সেবায় এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে কয়েকশো সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে মিষ্টি মুখ করানো হয়।

ইটাহারে দশ দিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

সংস্কৃত ভারতীর উদ্যোগে উত্তরদিনাজপুর জেলার ইটাহারে দশ দিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির ইটাহার সারদা শিশুতীর্থে গত ১৩ থেকে ২২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ২ ঘণ্টা ধরে অভিনব পদ্ধতি দ্বারা সংস্কৃত শেখানো হয়। ৮০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। শিবিরে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। শিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাস্কর ঘোষ, নেপাল বর্মন। সমাপ্তি অনুষ্ঠান অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন সারদা বিদ্যামন্দিরের প্রধানাচার্য বাবলু সরকার। এছাড়া রায়গঞ্জ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভবনের সংস্কৃত শিক্ষক টিঙ্কু হালদার। শিবিরের ছাত্রছাত্রীরা দশদিনে যতটা শিখেছেন তা সংস্কৃত ভাষাতেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা দেখিয়েছেন।

উত্তরবঙ্গ বজরঙ্গ দলের শিক্ষণ শিবির

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুব শাখা বজরঙ্গ দলের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ বর্গ উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলায় পুণ্ডিবাড়ি শিশু মন্দিরে গত ২, ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

এই সময়

রুবির ক্যান্সার

মুম্বই পুলিশের ডগস্কোয়াডের নক্ষত্র রুবিকে চোখের জলে সবাই বিদায় জানাল। রুবির

ক্যান্সার হয়েছিল। ২০০৯ সালে কাজে যোগ দেবার পর থেকে ৪১টি কেসে পুলিশকে সাহায্য করেছে রুবি। এক সময় তাকে বাদ দিয়ে বড়ো অভিযানের কথা ভাবাই যেত না।

অগ্রজের প্রতি সম্মান

প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি নব্বই বছরে পদার্পণ করলেন। প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদী তাঁর বাড়িতে গিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। পরে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা, বিজেপির কার্যকর্তারা সবসময় তাঁর সাহায্য পেয়েছি। প্রার্থনা করি তিনি সুস্থ থাকুন।'

অমিতবিক্রম

কংগ্রেসের অনর্গল অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি

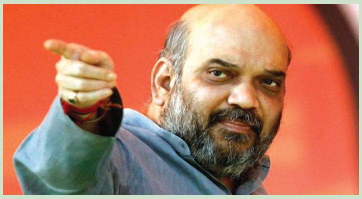

অমিত শাহ। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস চিরকাল গরিব মানুষের দুর্দশাকে ব্যবহার করে ক্ষমতা দখল করেছে। তবে, সেটা আর সম্ভব নয়। মানুষ ওদের কুমিরের কান্না খুব ভালোই চেনেন।'

বর্গে ৩টি জেলা থেকে ৫৫ জন অংশগ্রহণ করেন। মালদা বিভাগের বজরঙ্গ দলের বর্গ মালদা নগরে অরবিন্দপার্ক শিশু মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। ১২০ জন অংশগ্রহণ করেন। বর্গে উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক ডাঃ শচীন সিংহ, প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক

গৌতম সরকার, প্রান্ত সম্পাদক উদয়শঙ্কর সরকার। চর্চা ও বৌদ্ধিকের মাধ্যমে সকলের মধ্যে হিন্দুত্বভাব জাগ্রত করা হয়। দু'টি বর্গ পরিচালনা করেন যথাক্রমে প্রদীপ থাপা ও মন্টু সরকার। মালদা বর্গের উদ্বোধন করেন মালদার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. তুষারকান্তি ঘোষ।

দিল্লিতে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের মহা জনসম্মেলন

গত ২৯ অক্টোবর দিল্লির রামলীলা ময়দানে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চে'র পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা অভিযানের সমাপ্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে মহা জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ থেকে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়েছিল। অনুষ্ঠানের শুরুতে ছোট নাটিকা গীত ইত্যাদির দ্বারা চীনের সামগ্রীর ভারতের বাজারে অনুপ্রবেশের

কুফল বোঝানো হয়েছিল। দ্বিপ্রহর থেকে বিভিন্ন সংগঠনের আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ সভায় উপস্থিত হতে আরম্ভ করেন এবং নিজেদের বক্তব্যের দ্বারা চীন বিরোধী এই অভিযানের তাৎপর্য জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেন। লঘু উদ্যোগ ভারতী, অখিল ভারতীয়

কিষাণ সঙ্ঘ, অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত ইত্যাদি সংগঠনের ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে চীনের আগ্রাসনে ভারতীয় অর্থনীতির সম্ভাব্য ক্ষতির ব্যাখ্যা করেন। এছাড়াও চীনের দ্বারা অত্যাচারিত দলাই লামার প্রতিনিধিবর্গ ও সন্তদের উপস্থিতিতে বক্তব্য উপস্থাপনে সমাবেশ হয়ে উঠেছিল জমজমাট। এছাড়াও সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কর্তাব্যক্তিরা তাঁদের অভিজ্ঞতায় চীনের বিপদ উপলব্ধি করে ব্যাখ্যা করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৯৪ জন কার্যকর্তা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিগত এক বছর ধরে ভারতীয় অর্থনীতিতে চীনের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ এক প্রতিবাদ কর্মসূচি দেশ জুড়ে চালিয়েছে। রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা অভিযান নামক সেই প্রতিবাদ কর্মসূচির অন্তিম অনুষ্ঠান হলো এই মহা জনসমাবেশের মাধ্যমে।

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের প্রাদেশিক একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ৪ ও ৫ নভেম্বর পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম দক্ষিণবঙ্গের পরিচালনায় পশ্চিম পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর খণ্ডের রাঙাডি কল্যাণ আশ্রম সংলগ্ন ময়দানে দক্ষিণবঙ্গের ২১তম প্রাদেশিক একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দক্ষিণবঙ্গের ১২টি জেলা থেকে তীরন্দাজী, অ্যাথলেটিক্স ও খো খো প্রতিযোগিতায় সর্বমোট ২১৭ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে পুরুষ প্রতিযোগী ১৭০ জন এবং মহিলা প্রতিযোগী ৪৭ জন।

অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বলরামপুরের ডাভা গোপলডি আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গুরুচরণ সরেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়ার লালপুরের মহাত্মা গান্ধী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শশীকান্ত মুর্মু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়ার সিধো কানহো বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সুবোধ হাঁসদা। প্রধান বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়ার ঝালদা হিন্দী হাইস্কুলের ক্রীড়া ও শারীরিক বিষয়ক শিক্ষক অমর পাল। অনুষ্ঠানের সভাপতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। উদ্বোধনী ভাষণ রাখেন পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের প্রান্তক্রীড়া প্রমুখ বিষ্ণুচরণ মাহাত। এরপর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলাকে বনবাসী সমাজের মধ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিযোগীদের সামনে উৎসাহমূলক বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শেষে সভাপতি মহাশয় প্রতিযোগীদের উদ্দেশে খেলাধুলা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এবং খেলা পরিচালনার জন্য অনুমতি প্রদান করেন।

এই সময়

বন্ধন এক্সপ্রেস

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বাংলাদেশের শেখ হাসিনা এবং পশ্চিমবঙ্গের

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একসঙ্গে দুই দেশের একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে বন্ধন এক্সপ্রেস নামের একটি ট্রেন। ট্রেনটি কলকাতা ও খুলনা রুটে চলাচল করবে।

গতিময়

বাগান-শহরের তকমা আগেই জুটেছিল, বেঙ্গালুরুর ভাগ্যে এবার জুটল বিশ্বের সব

থেকে গতিমান শহরের তকমা। সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক মানের সংস্থা ভারতের আইটি-রাজধানীকে এই শিরোপা দিয়েছে। সানফ্রানসিসকো রয়েছে দু'নম্বরে।

নোটনাকচ

কেন্দ্রের নোটনাকচের সিদ্ধান্ত নিয়ে গেল গেল রব তুলেছেন বিরোধীরা। অথচ আয়কর

দপ্তরের সূত্র, প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ গতবারের তুলনায় এ বছর ১৫.২ শতাংশ বেড়েছে। ৪.৩৯ লক্ষ কোটি টাকা অতিরিক্ত আদায় হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্তারা।

গরিবকে বন্দি করে রাখার কাচের ঘর ভেঙে দিচ্ছে মোদী সরকার

অতিথি কলম

এম জে আকবর

আজকাল সংস্কার কথাটি ভারতীয় জীবনের যেন একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছে। প্রায় ২৫ বছর ধরে দৃঢ়ভাবে চেপে বসে থাকা একটি তত্ত্ব বা ফরমুলা ক্রমাগত এদিক ওদিক বা চক্রবৎ ঘুরে চলেছিল যেন তার বাইরে যে কিছু হয় না এমনটাই লোকের বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। অর্থনীতির চাকা এই কর্দমাক্ত প্রান্তরে প্রায় ডুবে গিয়েছিল। আর ২০১৪ পর্যন্ত এ দেশে ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্যের নিরিখে ভারতের স্থানটি ছিল সারির প্রায় শেষের দিকে ১৪২-এর লজ্জাজনক স্থানে।

এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি থেকে দেশকে টেনে তুলতে প্রধানমন্ত্রী সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টার ফল ফলতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিকতম মূল্যায়নে ভারত এক লাফে মইয়ের ১০০তম ধাপে উঠে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী এই উত্তরণকে ৫০-এর ঘরে নিয়ে যেতে চান। তিনি লক্ষ্যে পৌঁছবেনই।

তবুও 'সংস্কার' নরেন্দ্র মোদী নামক গল্পের একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। তিনি ১০ কোটি গরিব ভারতীয় পরিবারকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের আকাঙ্ক্ষিত সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার ভগীরথ হতে বদ্ধপরিকর। এই দীর্ঘ দিন ধরে অবহেলিত অংশের ক্ষমতায়ন ও সেই সূত্রে লিঙ্গ নির্বিশেষে উন্নয়নই তাঁর অভিষ্ট, আর এই লক্ষ্যের নির্দিষ্ট সময়সীমা ২০২২ সাল। তবে এই লক্ষ্যপূরণ কেবলমাত্র সংস্কারের মাধ্যমে সম্ভব নয়। দেশের সম্পদের ব্যবহারে বড় ধরনের পরিবর্তনের সঙ্গে সরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলির অভিমুখও কোনো বিশেষ শ্রেণীর লক্ষ্য হওয়ার বদলে শ্রেণী ও জাতপাত নিরপেক্ষভাবেই পরিচালিত হবে। যাতে এযাবৎ সব ধরনের বঞ্চিতরা সরকারি মদতে নিজেরাই নিজেদের নিয়োগকর্তা হয়ে উঠতে পারেন। শুধু চাকরির মুখাপেক্ষী থেকে জীবন অপচয় করা আর নয়। কিন্তু দেশে চালু থাকা অন্যায্য উত্তরাধিকারসূত্রে সুবিধে ভোগকারীরা সহজে জায়গা ছেড়ে দেবে না। স্বার্থান্বেষী মহল তাঁদের দীর্ঘদিনের 'পেয়ে থাকার' অধিকার ছাড়তে হলে নিশ্চিত লড়াই করবে।

ভারতের গরিব নাগরিকরা এতকাল তিনটি লক্ষ্মণরেখায় বা নিষিদ্ধ সীমানায় আটকে থাকতে বাধ্য ছিলেন। (১) দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা থেকে দূরে থাকা, যার ফলে তাঁরা ব্যাঙ্ক থেকে যে কোনো ধরনের ঋণ নিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করার কথা ভাবতেই পারতেন না। ব্যাঙ্কের ঋণদান ব্যবস্থা অনেকটাই পিরামিডের ওপরের দিক যেমন কৌণিক পদ্ধতিতে সরু হয়ে আসে ঠিক সেইরকম সরকারি অর্থ একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে খুব সহজে ও বিপুল পরিমাণে বিতরিত হতো। এটিকে 'সহযোগী পুঁজিবাদ' (crony capitalism) না বলে নিখাদ crony corruption বা দুর্নীতির উৎকট প্রতিষ্ঠানীকরণ বলাই সঠিক। সহজেই বোঝা যায় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা থেকে দূরে থাকায় গরিবদের দালালদের খপ্পরে পড়া ছাড়া উপায় ছিল না। সকলেই জানেন এই নিতান্তই ব্যক্তিগত উদ্যোগে অর্থের হাত বদলে কী বিপদগ্রস্তই না গরিব মানুষদের হতে হতো।

প্রধানমন্ত্রী মোদী এই অবস্থার অবসান ঘটাতে একই সূত্রে বাঁধা কতকগুলি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত পরপর নিতে থাকলেন। বেশিরভাগ পর্যবেক্ষক বা বিরুদ্ধাচারীরা কিন্তু ধরতেই পারছিলেন না যে কোনও পদক্ষেপের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পরের পদক্ষেপটি তিনি করতে চলেছেন। মানে প্রথমটির পর দ্বিতীয় বা তৃতীয়টি কী হতে পারে তার কোনো ধারণাই তাদের ছিল না। বিবর্তনটার সুচনা হয়েছিল 'জনধন খাতা' খোলার প্রকল্প দিয়ে।

> "একের পর এক বহুমুখী ফলাফল আসতে লাগল। এর মধ্যে জিরো ব্যালান্স-এর তকমা দিয়ে বিদ্রূপ করা বাহিনীর পক্ষে নিতান্ত অস্বস্তিকর পরিসংখ্যান এল, ওই ৩০ কোটি শূন্য-কলসী খাতায় এখন সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ৬৬৪৬৬ কোটি টাকা। গরিবরা বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে একটা নিরাপদ সঞ্চয়ের রাস্তা খুঁজে পেল।"

সারা বিশ্বে এত বড় যোজনা আর কখনও হয়নি। মাত্র তিন মাসের মধ্যে দেশের ব্যাঙ্কগুলিতে ৩০ কোটি গরিব মানুষের অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। তাঁরা ব্যাঙ্কে যাওয়ার ছাড়পত্র পান। সমালোচকরা ঠাণ্ডা ঘরের চ্যানেলগুলিতে বসে বিদ্রূপ করতে শুরু করলেন, আরে এসব লোকদেখানো খাতাগুলোতে তো কোনো টাকাই নেই, জিরো ব্যালান্স! দেখুন, তাঁরা কিন্তু বিষয়টাকে ধরতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেন।

সেই প্রথম যাদের কাছে টাকা আছে তাদের ছাড়াও যাদের হাতে টাকা নেই এমন দেশবাসীর জন্য ব্যাঙ্কের দরজা খুলে গেল। এর পর বহুমুখী ফলাফল একের পর এক আসতে লাগল। এর মধ্যে জিরো ব্যালান্স-এর তকমা দিয়ে বিদ্রূপ করা বাহিনীর পক্ষে নিতান্ত অস্বস্তিকর পরিসংখ্যান এল ওই ৩০ কোটি শূন্য-কলসী খাতায় এখন সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ৬৬৪৬৬ কোটি টাকা। গরিবরা বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে একটা নিরাপদ সঞ্চয়ের রাস্তা খুঁজে পেল।

দ্বিতীয়, মুদ্রা যোজনা— খুব সুন্দরভাবে কেউ বলেছেন যে 'যাকে টাকা কখনও দেওয়া হয়নি তাকে টাকা দাও।' এর ফলে দ্বিতীয় কাচের লক্ষ্মণরেখা ভেঙে পড়ল। কোনো আলাদা সিকিউরিটি ছাড়াই গরিবরা পেতে থাকলেন। 'জনধন' খাতা না থাকলে এ ব্যাপারটা তো সম্ভব হতো না। মুদ্রা প্রকল্পে সুদখোরদের থেকে টাকা নিয়ে চড়া সুদ দিয়ে নাস্তানাবুদ হওয়া থেকে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা বাঁচার রাস্তা পেলেন। এরই পরিণতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী ৫০ হাজার টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেয়ে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী নিজেরাই উদ্যোগপতি হয়ে উঠেছেন।

গ্রাম শহরে পোলট্রি, ডেয়ারি, সেলাই মেশিন, সেলুন, বিউটি পার্লার, রাস্তার ফার্স্ট ফুডের দোকান থেকে পাকা দোকান করে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার অজস্র বাস্তব কাহিনি রয়েছে। উৎপাদনমূলক কাজ বা সার্ভিস প্রভাইডিং--- এই পরিধিতে সকলেই রয়েছে। এই মুদ্রা যোজনার সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক দিকটি হচ্ছে লিঙ্গ নিরপেক্ষতা। মেয়েরা তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই প্রকল্পে অভাবনীয় সংখ্যায় যোগ দিয়েছে।

২০১৫ সালের ৮ এপ্রিল চালু হওয়ার পর থেকে ৯.১৩ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। এই টাকার ৭৬ শতাংশ অর্থাৎ ৬.৮৯ কোটি টাকা নিয়েছেন মেয়েরা। আবার এর মধ্যে ৫৫ শতাংশ ঋণগ্রহীতা তপশিলি জাতি, উপজাতি অবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনজাতির সদস্য। ১৩ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের।

এর পরই এল সব থেকে কঠিনতম নিষিদ্ধ কক্ষ। এটিকে ভাঙা এক কথায় ছিল দুষ্কর, কেননা এর ছাদ ছিল গ্রানাইটের সংমিশ্রণে অর্থাৎ কালোটাকা দিয়ে তৈরি। আর অর্থনীতির নীচের মহলের কুকর্মগুলি সবই এই ওপরমহলের ছত্রছায়ায় হতো। তৃতীয় লক্ষ্যটি তাই ছিল কালোটাকে আটকানো, করদাতার সংখ্যায় বৃদ্ধি ঘটানো। একই সঙ্গে লুকিয়ে রাখা টাকাকে বের করে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার আওতায় আনা। কারণ অনুপাদক (এনপিএ) সম্পদের ধাক্কায় ব্যাঙ্কব্যবস্থা জেরবার হয়ে পড়েছিল।

সকেলেই জানেন, অ্যাসপিরিন খেলে ক্যানসার যাবে না, তার জন্য প্রয়োজন হয় কেমোথেরাপির। কালোটাকার জন্যও সেটাই দরকার ছিল। এই লড়াইয়ে বিমুদ্রীকরণ ছিল কঠিনতম অস্ত্র, কেননা অসুখটা দেশের অর্থনীতিকে ভেতর থেকে কুরে কুরে শেষ করে দিচ্ছিল। কালোটাকার প্রতাপ ছিল দেশের অর্থনীতির পক্ষে প্রাণহানিকর। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকরা লক্ষ্য করেছেন ৮.১১.২০১৬-র বিমুদ্রীকরণের পর ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে অনেকটাই প্রাণসঞ্চার হয়েছে। বিমুদ্রীকরণের ৫ মাস আগে ব্যাঙ্কের মোট এনপিএ ছিল ৬ লক্ষ কোটি টাকা। আজকের ব্যাঙ্কগুলি ঋণে সুদের হার কমাবার জায়গায় রয়েছে। নগদের জোগান অনেক বেশি। বেআইনি টাকাকে আইনি টাকায় রূপান্তরের যাদুদণ্ডধারী কার্তুজের খোল তৈরির কোম্পানিগুলির ওপর খাঁড়া নেমে এসেছে। কম নয়, ২ লক্ষ কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে গেছে। তারা কেউই তাদের বাৎসরিক ট্যাক্স রিটার্ন দেয়নি।

গরিবদের জীবনে কী ধরনের গুণগত পরিবর্তন এসেছে তা ব্যাখ্যা করতে সংখ্যাতত্ত্ব ততটা শক্তিমান নয়। তবে বিগত তিন বছরে অর্থনৈতিক ভাবে সরাসরি উপকৃতের সংখ্যা অভাবনীয়ভাবে ১০.৭১ কোটি থেকে বেড়ে ৩৫.৭ কোটিতে পৌঁছেছে। এই অর্থনীতির ভাগীদার হওয়া নাগরিকেরা উল্লেখিত সময়সীমায় ৭৩৬৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৭৪৬০৭ কোটি টাকা অর্থাৎ ১০ গুণ বেশি অর্থের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। মধ্যস্বত্বভোগীরা তাদের ওপর নেমে আসা আঘাতে এখন মলম লাগাচ্ছে আর সরকারের বাপান্ত করছে। তারা সরকারের বিরুদ্ধে লোকবল বাড়াবার চেষ্টায় ত্রুটি রাখছে না।

সরাসরি ব্যাঙ্কে চলে যাওয়ার ডিবিটি (ডাইরেক্ট ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার) প্রকল্পের সংখ্যা ২০১৩-১৪ সালের ২৮টি থেকে এই অর্থনৈতিক বছরে ৩১৪টিতে পৌঁছে গেছে। ৪০ কোটিরও বেশি মানুষ সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক খাতায় সরকারি টাকা পৌঁছনোর সুযোগ পাচ্ছেন। সঙ্গে আরও একটি অসাধারণ তথ্য পাওয়া গেছে, এর ফলে সরকারি কোষাগারে ৫৭ হাজার ২৯ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

আপনারা তো জানেন, যখন কাচের ছাদ ভেঙে পড়ে তখন মেঝেটা ভাঙা কাচের টুকরোয় ভরে যায় আর চারদিকে খুব আওয়াজ শোনা যায়। কিন্তু যাঁরা মনে করে বসে আছেন যে আসলে এইসব ভাঙচুর করার অর্থ নির্বাচন জেতা, এর সারবত্তা কিছু নেই। আর রাজনৈতিক যুক্তি খাড়া করার বদলে যাঁরা চেঁচিয়ে মাত করতে চান তারা আদৌ জানেনেই না নির্বাচকমণ্ডলীর মন কীসে প্রভাবিত হয়। প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন তাঁর একটিই জীবন আর একটিই লক্ষ্য--- সংস্কার, করে দেখানো ও ফলশ্রুতিতে নিশ্চিতভাবে স্থিতাবস্থা বদলানো। আজকের ভারত ক্লান্ত। সে জলাভূমির আবদ্ধতা থেকে নতুন ভারত হতে চায়। ■

চিঠিপত্র

তাজের প্রকৃত ইতিহাস উন্মোচন হোক

আমাদের দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা কখনো চাননি তাজমহলের প্রকৃত ইতিহাসটি উন্মোচিত হোক। সম্রাট শাহজাহানের প্রেমের সংজ্ঞাটি খুবই ঘৃণে ধরা। তিনি মুমতাজকে পেতে তার প্রথম স্বামীকে খুন করেন। পরপর ১৩টি সন্তানের জন্ম দিয়ে ১৪তম কন্যা গৌহারা বেগমের প্রসবের সময় রক্তশূন্যতায় মমতাজের মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পর নিজ শ্যালিকার সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ হন শাহ্‌জাহান। উল্লেখ্য যে মমতাজ শাহজাহানের চতুর্থতম (সর্বমোট ৭ জন) বিবি। তাজমহল চত্বরে মুমতাজ বেগমের পাশাপাশি তার দু'জন বিবি সতিউন্নেসা খানম এবং সরহন্দি বেগমেরও সমাধি আছে। এছাড়াও অর্জুমান্দ বানু নামে এক প্রিয় পরিচারিকারও কবর আছে। প্রেম তো পবিত্র, নিঃস্বার্থ কিন্তু শাহজাহানের প্রেম যৌন লালসায় ভরপুর। তাই তাজকে প্রেমের নিদর্শন আখ্যায়ন প্রেমের পবিত্রতাকে কলুষিত করারই নামান্তর। ভারতবর্ষে মুসলমান, মুঘল, তুর্কির বিদেশি আক্রমণে বহু মন্দির চূর্ণ হয়েছে আর উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলো মসজিদে রূপান্তর করা হয়েছে।

মোগল সম্রাট শাহজাহানও এক মন্দিরকে অধিগ্রহণ করে তাজমহলে রূপান্তর করেছেন। ইতিহাসবিদ পুরুষোত্তম নাগেস ওক তাঁর এক গবেষণা 'Tajmahal : The True Story '-তে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে তাজমহল বাস্তবে এক মন্দির ছিলো শাহজাহান তাজ নির্মাণ করেননি। তাঁর এই থিওরি এতই বিজ্ঞানসম্মত যে বিদেশি অনেক ঐতিহাসিক এবং BBC-ও মানতে বাধ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে শাহজাহান ভবনটি দখল করে তার স্ত্রীকে দাফন করায়। মোল্লা আব্দুল আহমেদ লাহিড়ীর বিবরণী, 'বাদশাহনামা' (VOLUME 1, PAGE 403)-তে অকপটে স্বীকার করা হয়েছে যে মমতাজ বেগমের সমাধি স্থাপনের জন্য শাহজাহান জয়পুরের রাজা জয়সিংহের কাছ থেকে এক বিশাল প্রসাদ দখল করে নিয়েছিলেন।

স্থাপত্য শৈলীতে তাজমহল সম্পূর্ণ একটি শিব মন্দির। কারণ মহলটির গম্বুজের মাথায় আজও শিবের ত্রিশূল বিদ্যমান। মহলটিতে পদ্মফুলের অনেক কারুকার্য আছে যা শুধু কোনো মন্দিরেই থাকা সম্ভব। শিব মন্দিরের ন্যায় এখনো তাজমহলকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। তাজের মূল ছাদে এখনো শিকল ঝুলানো আছে যার সঙ্গে মঙ্গলঘটের লিঙ্ক পাওয়া যায়। তাজমহলে স্থাপিত শিবলিঙ্গের নাম তেজোলিঙ্গ। তাজমহলের পূর্ব নাম তেজোমহালয়। এমনটাই ইতিহাসবিদের দাবি। তাজমহলের পূর্বের অনেক রীতি-রেওয়াজ আজও দৃশ্যমান, যা শুধু একমাত্র মন্দিরগুলোতেই থাকে। একবার তাজমহলে ফাটল দেখা দিলে তা মেরামতির জন্য একটু দেওয়াল খুঁড়তেই বিভিন্ন দেবদেবীর আঁকা মূর্তি বেরিয়ে আসে। তৎকালীন সরকার ইতিহাস ধামাচাপা দিতে স্থায়ীভাবে সেই কক্ষগুলো বন্ধ করে দেয়। আন্তর্জাতিকভাবেও প্রমাণিত হয়েছে তাজের রূপকার শাহজাহান নন। আমেরিকার ব্রুকলিন কলেজের রেডিও কার্বন ল্যাবরেটরির অধ্যক্ষ ড. ইভান উইলিয়ামের তত্ত্বাবধানে তাজের এক কাঠের নমুনার 'কার্বন ১৪' পরীক্ষায় জানা যায় সেটা ১৩২০ থেকে ১৪০০ সালের মধ্যে কোনো এক সময়ের তৈরি। অর্থাৎ শাহজাহানের সময় থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগের। এখন প্রশ্ন, প্রফেসর ওকের পর আজ পর্যন্ত কাউকে কেন তাজের গবেষণা করতে দেওয়া হয়নি? তাজের বন্ধ কক্ষগুলো কেন তালাবন্ধ রয়েছে? তাজ আমাদের সবার মুকুট, তাজমহল সম্পূর্ণ অটুট থাকুক। কিন্তু চাই তাজের প্রকৃত এবং নিরপেক্ষ ইতিহাস উন্মোচন হোক।

—**রঞ্জন কুমার দে**, শিলচর, অসম।

কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতা

প্রাক স্বাধীনতা যুগে প্রথমসারির নেতৃবৃন্দ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি নিয়ে

প্রতিযোগিতায় বারবার অবতীর্ণ হয়েছেন। ১৯৪৬-এর অবিভক্ত বাংলাদেশে দুটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে, প্রথম কলকাতায় ১৬ আগস্ট এবং দ্বিতীয়টি ১০ অক্টোবর ওপার বাংলার নোয়াখালি। প্রথমে কলকাতা ছুঁয়ে নোয়াখালিতে মহাত্মা গান্ধী হাজির হলেন তারপর স্বল্প ব্যবধানে হাজির হলেন তাঁর ভাবশিষ্যরা। সফর সঙ্গী অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু ২৭.১২.১৯৪৬ ডায়েরিতে লিখেছেন— ''রাত্রি সাড়ে ১১ টায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, আচার্য কৃপালানি, শঙ্কর রাও দেও, মৃদুলা সারাভাই এসে পৌঁছালেন। আচার্য পথ হারিয়েছিলেন বলে ঘণ্টাখানেক পরে এলেন।'

অধ্যাপক বসু লিখেছেন— ২৮ মে সারাদিন কথাবার্তা চলল তার মধ্যে থাকিনি। মাঝে মাঝে শুনছিলাম। একবার পণ্ডিতজী বলে উঠলেন— 'There is a Hindu political India today, just as they have made a Muslim political India.' খানিকটা ঝোঁক দিয়ে বললেন, সকলেই আজ সাম্প্রদায়িক হয়ে গেছে, বাপু, উনি নিজে এবং সকলেই।'' এইরূপ অসংলগ্ন কথার মধ্যে স্ববিরোধিতার বাক্যজাল বুনেছেন পণ্ডিত নেহরু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকে শেষ অবধি।

হিন্দু রাজনীতিকে কাঠগোড়ায় তুলে পণ্ডিত নেহরু কোন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করলেন? স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে দুটি ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের মূলে হিন্দু রাজনীতির প্রতি অভিযোগের আঙুল তুলে মুসলমান রাজনীতি এবং মুসলমান রাজনীতিকদের লাগাম ছাড়া আবদারগুলি স্বীকার করে নোয়াখালিতে দাঁড়িয়ে সাফাই গাইলেন। আজ যারা কংগ্রেস ঘরানার মাহাত্ম প্রচার করে এবং নিজেদের গর্ববোধের সীমা অতিক্রম করে 'হিন্দুরাজনীতি'র কারণে 'মুসলমান- রাজনীতি' সৃষ্টি এইরূপ

পক্ষপাতিত্ব মূলক বাক্যজালে একটা চরম সত্যকে বিভ্রান্তিমূলক মায়াজালে আবদ্ধ করে দিয়েছেন, তাদের রাজনীতিবোধের দৈন্যতা কত প্রকট দেশবাসী আজ তা প্রত্যক্ষ করছেন। ১৯০৩ থেকে ১৯৪৭ অবধি স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেসের মুসলমান তোষণ এবং ব্রিটিশশক্তির নিকট নিঃশর্ত নতজানু হওয়ার মধ্যে হিন্দুরাজনীতি কোনোদিনই মাথা তুলতে দেয়নি।

মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত স্থানগুলিতে গিয়ে সেখানকার ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণের চেয়ে কংগ্রেসের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিণতি নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন। নোয়াখালি দাঙ্গার অব্যবহিত পরে দাঙ্গার প্রতিশোধ যখন বিহারে প্রতিফলিত তখন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হয়ে পণ্ডিত জওহরলাল দাঙ্গা থামাতে আকাশ থেকে বোমা ফেলে দাঙ্গা নির্মূল করার কথা বলেছিলেন। গান্ধীজী বলেছিলেন জওহরলালের উচিত একজন কংগ্রেসকর্মীর ভূমিকা পালন করা। এখানে একটা প্রশ্ন, সেদিন জওহরলালের দ্বৈত ভূমিকার মধ্যে একটা প্রশাসনিক প্রধান ও কংগ্রেসিয়ানা কোনোটার কি ঘাটতি ছিল?

পণ্ডিত নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি কেমন ছিল তাঁর আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থে ১৯০৭-র কংগ্রেসের চরমপন্থা ও নরমপন্থার ধারাটি কোন খাতে প্রবাহিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে তাঁর লেখনীতে আভাস পাওয়া যায়— "Socially speaking the reveal of Indian Nationalism in 1907 was definitely reactionary. Inevitably a new Nationalism in India as elsewhere in the East was a religious nationalism." বুঝতে অসুবিধা হয় না ১৯০৭-এর সুরাট কংগ্রেসে তিলককে সভাপতি করা নিয়ে যে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যে বিরোধ সৃষ্টি হয়, কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে, পণ্ডিত নেহরু সেই ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রেখেই 'প্রতিক্রিয়াশীল' শব্দটি চয়ন করেছিলেন।

১৯২০-র ৫ জানুয়ারি শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ তিলক সহকর্মী যোশেফ ব্যাপ্টিস্টাকে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ক এক পত্রে লিখেছিলেন— 'আমি রাজনীতিকে এবং রাজনৈতিক কর্মকে হেয় জ্ঞান করি না, কিংবা মনে করি না সেসবের উর্ধ্বে উঠে গেছি। আমি সর্বদা আধ্যাত্মিক জীবনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি, কিন্তু আমার আধ্যাত্মিক ধারণার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ের উপর সন্ন্যাসীসুলভ বৈরাগ্য বা ঘৃণা বা বিরক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। আমার কাছে কিছুই ধর্মনিরপেক্ষ নয় এবং সকল মানবীয় কার্যই সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এখন রাজনীতির গুরুত্বই বেশি, রাজনৈতিক কর্মধারার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি রাজনৈতিক কর্মধারায় প্রবেশ করে ১৯০৩ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত শুধু একটি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেছি, তা হলো ব্যর্থ স্বচ্ছন্দগতি কংগ্রেসি পদ্ধতির পরিবর্তে স্বাধীনতার জন্য এক স্থির সংকল্প এবং সংঘর্ষের প্রয়োজনবোধ জনগণের মনে সঞ্চার করা।'

অরবিন্দ ঘোষের রাজনৈতিক কর্মজীবনে ছেদ পড়ে যায় ১৯১১ সালে। পণ্ডিত নেহরুর রাজনীতিতে পদার্পণ ঘটে তার এক দশক পর। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এই আভিধানিক শব্দটি নিয়ে পণ্ডিত নেহরু কংগ্রেসের মঞ্চে সবচেয়ে বেশি চর্চা করেছেন এবং আজও তাই জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তার সংজ্ঞা ধর্মনিরপেক্ষতার রক্ষা কবচে একপ্রকার মুখ লুকিয়ে বিদ্রূপ করে যাচ্ছে।

—**বিরূপেশ দাস,** বর্ধমান।

স্বস্তিকার মতো পত্রিকাগোষ্ঠী আরও সক্রিয় হোক

আমি স্বস্তিকা পত্রিকার একজন গ্রাহক ও নিয়মিত পাঠক। আজ যখন বেশিরভাগ বাংলা সংবাদপত্র ও পত্রিকাগুলি সমাজ-জাগরণের কাজে ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনায় তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে না এবং অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুদের ওপর ঘটে যাওয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অত্যাচারের খবর চেপে যাচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করছে এবং বিভ্রান্তিমূলক প্রবন্ধ ছাপিয়ে হিন্দু-সমাজকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার চেষ্টা করছে, সেই সময় সমাজকে সচেতন করার কাজে স্বস্তিকা পত্রিকার ভূমিকা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

আজ বাংলার হিন্দুসমাজের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ, স্বধর্মনিষ্ঠা, জাতীয় চেতনা ও দেশভক্তির চরম অভাব। তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুরা আজ বিদেশি ভাবধারা ও বিদেশি আচার আচরণে, চলনে- বলনে, পোশাক-আশাকে এতই অনুরক্ত যে তারা ভুলে গেছে তাদের পূর্বপুরুষরা বিদেশি নাগপাশ থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। আর সমাজের এই আত্মবিস্মৃতি, ধর্মহীনতার সুযোগ নিয়ে ম্লেচ্ছশক্তি সমাজকে গ্রাস করতে তাদের কর্মকাণ্ড নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাচ্ছে। তারা যতটা সক্রিয়, হিন্দুসমাজ ততোধিক নিষ্ক্রিয় ও ঘুমন্ত। দেশ ও সমাজের এই দুর্দিনে শুধু সংবাদপত্র, লেখক ও পত্রপত্রিকার ইতিবাচক ভূমিকাই পর্যাপ্ত হতে পারে না। বিভিন্ন আশ্রম, মঠ ও মন্দিরের সাধুসন্তদেরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া দরকার। তাঁরাও তাঁদের আশ্রমের চৌহদ্দি ছেড়ে একবার হিন্দু জনসমাজের মধ্যে সমাজ জাগরণের কাজে বেরিয়ে পড়ুন। শিবাজীর গুরু এভাবেই মহারাষ্ট্রের হিন্দু সমাজের মধ্যে জাতীয় জাগরণের চেতনা এনেছিলেন। ভূষণকবি, চারণকবি মুকুন্দদাস তো এভাবেই গান গেয়ে জাতির ঘুম ভাঙিয়েছিলেন।

হিন্দু যুবক-যুবতীরা আজ বেশিরভাগই তমোগুণে নিমজ্জিত। আর তাদের আদর্শ যেন চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকারা। ভোগবাদে নিমজ্জিত কিছু হিন্দু মেয়ে আজ প্রেম-জেহাদের শিকার হয়ে বিধর্মীদের ঘরে চলে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন, দেশদ্রোহীদের সমর্থনে স্লোগান দেওয়া ও দেশকে টুকরো টুকরো করার স্লোগান দেওয়াকেই বীরত্ব মনে করছে।

দেশের এই সঙ্কটাবস্থায় স্বস্তিকার মতো পত্রিকাগোষ্ঠী, মঠ-মিশনের সাধু-সন্ন্যাসীদের আরও সক্রিয়ভাবে সমাজের মধ্যে আবির্ভূত হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

—**দিলীপ কুমার পাল,**
উত্তর গড়িয়া, কলকাতা-৮৪।

সমন্বয়ের প্রতীক কার্তিক

নন্দলাল ভট্টাচার্য

জিজিং জিজিং জ্যাংলা
কার্তিক ঠাকুর হ্যাংলা
একবার আসে মায়ের সঙ্গে
একবার আসে একলা।

মা দুর্গার ছেলে-মেয়েদের সকলের সম্পর্কেই কথাটি সমান সত্যি। তবুও দোষের ভাগী শুধুই কার্তিক। দেবতাকে একবারে ঘরের ছেলে বানাবার যে প্রবণতা রয়েছে বাঙালি মানসে— এ বোধহয় তারই প্রতিফলন।

কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিনে প্রায় ভারত জুড়ে হয় কার্তিক পুজো। বঙ্গদেশে সর্বজনীন কার্তিক পুজোর জন্য তো কাটোয়া, বাঁশবেড়িয়া অনেকটা জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য চন্দননগরের মতোই বিখ্যাত। তবে শুধু সর্বজননীন পুজো নয়, বাড়ি বাড়ি ব্যক্তিগত কার্তিক পুজোর সংখ্যা লক্ষ্মী-সরস্বতীর মতো না হলেও খুব কম নয়। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ এখনকার বাংলাদেশের গৃহস্থের বাড়িতে এই পুজো প্রায় ঘরে ঘরে। ষষ্ঠীর মতোই মায়েরা এই সংক্রান্তির দিনে কার্তিক ব্রত পালন করে থাকেন।

সাধারণ ভাবে কার্তিক হলো দেবসেনাপতি। কার্তিক বিবাহিত নাকি কুমার তা নিয়েও আছে নানা কাহিনি। এক মতে কার্তিকের স্ত্রীর নাম দেবসেনা। প্রজাপতির এই মেয়ের সঙ্গে কার্তিকের বিয়ে দেন ইন্দ্র পিতামহ ব্রহ্মার সামনে। এই কাহিনি মহাভারতের। দেবসেনার পতি বলেই কি কার্তিক দেবসেনাপতি? অবশ্য পদ্মপুরাণে আছে, তারকাসুরকে বধ করার জন্য দেবতাদের একজন সেনাপতির প্রয়োজন হয়। আর সেই প্রয়োজনই মেটান মহাদেব-পার্বতীর সন্তান কুমার বা স্কন্দ বা কার্তিক। অন্য মতে কার্তিক চিরকুমার। তাই তাঁর অন্য নাম কুমার। সেই স্মৃতিতেই কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'।

কার্তিকের রূপ কল্পনায় রয়েছে সামরিক নেতার প্রভাব। আবার কার্তিক পূজিত হন অত্যন্ত বিলাসী হিসেবেও। ডাকাতদের যেমন কালীপুজো, এক সময় তস্করদের তেমনি ছিল কার্তিক পুজো। বিখ্যাত সংস্কৃত নাট্যকার শূদ্রকের 'মৃচ্ছকাটিক'-এ আছে তস্করদের কার্তিক পুজোর বিস্তৃত বিবরণ। বলা হয়েছে, তস্কররা কার্তিকেরই ছেলে। আর যে কারণেই কার্তিক তাদের জন্য লিখছেন চৌর্য শাস্ত্র— নাম যার 'ষন্মুখকল্প'। ঠিক কোন কারণে এদেশে গণিকারা কার্তিক পুজো করেন, তা বলা মুশকিল। সে কি ব্যক্তিজীবনে কার্তিক-নিঃসঙ্গতাই গণিকারা নিজেদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন তাঁকে?

কার্তিক আবার সন্তানদাতাও। তাই নিঃসন্তান দম্পতির গৃহে কার্তিক প্রতিমা ফেলে আসা এবং পরে তার পুজো করা এদেশের এক স্বীকৃত ব্যবস্থাও বটে। সন্তান কামনায় এদেশের সধবারা কার্তিক পুজো ও ব্রত পালন করেন।

এক মতে, সারা ভারতে প্রচলিত কার্তিক পুজো গণেশ অর্চনারও আগের থেকে চলছে। কিন্তু সনাতন হিন্দুদের যে পঞ্চ ধর্মসম্প্রদায় তার মতো কোনও আলাদা সম্প্রদায় গড়ে ওঠেনি কখনই কার্তিককে কেন্দ্র করে। উত্তর ভারতে সেভাবে কার্তিকের মন্দির বা তীর্থের সন্ধান সেভাবে না পাওয়া গেলেও দক্ষিণ ভারতে কিন্তু কার্তিক বা সুব্রহ্মণ্যম মন্দির এবং পুজো— দুয়েরই বাহুল্য নজরে পড়ে। এখনও দক্ষিণ ভারতে সুব্রহ্মণ্যম রূপী কার্তিকের পুজো চলে আসছে সেখানে প্রায় সম্প্রদায় নির্বিশেষে।

কার্তিক কি বৈদিক দেবতা? বেদে কি আছে কার্তিকের উল্লেখ? না, বেদে স্পষ্ট ভাবে কার্তিকের কোনও উল্লেখ নেই। সংহিতা এবং আরণ্যক যুগের পরে এঁর পরিকল্পনা রূপ পায়। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে কার্তিকের অন্য নাম স্কন্দ ও বিশাখ-এর উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে, এঁরা লৌকিক দেবতা। স্কন্দপুরাণে রয়েছে কার্তিকের ১০৮টি নাম। তার মধ্যে সবচেয়ে চলিত হলো কার্তিকেয়, স্কন্দ, কুমার, বিশাখ, মহাসেন, ব্রহ্মণ্য, সুব্রহ্মণ্য, নৈগমেয়, সনৎকুমার, গুহ, জয়ন্ত, ষড়ানন।

পুরাণগুলিতে কার্তিকেয়র জন্ম বা উদ্ভব সম্পর্কে রয়েছে নানা কাহিনি। প্রতিটি কাহিনির মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য থাকলেও বহিরঙ্গে বহু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সেসব কাহিনির সার কথা, কার্তিক শিব ও পার্বতীর পুত্র। তবে স্বাভাবিক পথে তাঁর জন্ম হয়নি। জন্ম মাত্র পরিত্যক্ত এ শিশুকে পালন করেছিলেন কৃত্তিকারা। তাই তাঁর নাম কার্তিক। আবার ছ'টি মুখে কৃত্তিকাদের স্তন্য পান করেছিলেন বলে এঁর নাম ষন্মুখ বা ষড়ানন।

কোথাও কোথাও একে অগ্নি এবং প্রজাপতি কন্যা স্বহার সন্তান বলা হয়েছে। কোথাও বা গঙ্গা এঁর মাতা। তবে প্রায় সবগুলির মধ্যেই

রয়েছে শিব-পার্বতীর একটা ভূমিকা।

অন্য কাহিনি, ব্রহ্মার মানসপুত্র পরমজ্ঞানী সনৎকুমারই হলেন স্কন্দ। তিনিই ছান্দোগ্য উপনিষদে স্কন্দরূপে উপদেশ দিচ্ছেন।

জন্ম কাহিনি যাই হোক, কার্তিকেয়র রূপ পরিকল্পনায় রয়েছে বেদের রুদ্র, সূর্য, অগ্নি প্রমুখ দেবতার প্রভাব। এঁদেরই নানা গুণের সমাহার দেখা যায় কার্তিকের মধ্যে। তাই অনেকের মতে কার্তিক শুধুই বৈদিক ও লৌকিক দেবতা নন, বেদের নানা দেবতারও সমাহার। কার্তিকের এই সমন্বয়ী রূপের জন্যই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেও গৃহীত হয়েছেন দেবতা কার্তিক। বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে স্কন্দ, কুমার এবং ময়ূরবাহন রূপে অথবা শিবের সঙ্গে কার্তিকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান শাখাতেও রয়েছে কার্তিকের উল্লেখ। একইভাবে জৈন শাস্ত্রে কার্তিকের নাম জয়ন্ত। এবং ওই নামেই অনুত্তর দেবতা হিসেবে রয়েছে তাঁর উপস্থিতি। অনুমান করা হয়, প্রাচীনকালে সূর্য পুজোর সঙ্গে ময়ূরবাহন কার্তিক পুজোর ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মহাভারত, পুরাণ এবং বিভিন্ন শিল্পশাস্ত্রে কার্তিকের সঙ্গে এবং হাতে মোরগ বা কুক্কুট রাখার নির্দেশ আছে। কার্তিকের এমন বহু প্রাচীন মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। কানপুরে লালা ভগত গ্রামে দ্বিতীয় শতকের কার্তিকেয় উপাসনার নিদর্শন হিসেবে যে ভাঙা স্তম্ভটি পাওয়া গেছে তার মাথায় রয়েছে একটি কুক্কুট। যাস্ক তাঁর নিরুক্তে (১২-১৩) বলেছেন, মোরগ হলো সূর্যের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী। আর এই স্তম্ভের গায়েও খোদিত রয়েছে সূর্যমূর্তি। ভবিষ্যপুরাণে আছে, স্কন্দ হলো সূর্যের অনুচর। তাঁর বাঁ দিকে তাঁর স্থান। সূর্যের পার্শ্বদেবতা রাজ্ঞ এবং কার্তিকেয় একই— এমন কথাও বলা হয়। মৎস্যপুরাণে নবগ্রহ পূজার সঙ্গে জড়িত কার্তিক। অর্থাৎ সূর্য ও কার্তিকেয়র সম্পর্কটা অতি ঘনিষ্ঠ।

সম্পর্কটা যে ঘনিষ্ঠ তা বোঝা যায় কার্তিকের পুজো প্রকল্প থেকেও। সাধারণত কোনও পাত্রে ধানের চারা তৈরি করা হয়। এই পাত্রের নাম জালা। কার্তিক প্রতিমার সামনে এই জালা রেখে পুজো করা হয়। এইভাবে কার্তিক পুজোর সঙ্গে ইতু বা মিত্র পূজার সাদৃশ্য সহজেই নজরে আসে।

কার্তিক পুজোর ঘট ছাড়া প্রতিমার সামনে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট ঘট রাখা হয়। এর মধ্যে থাকে চাল ও ফল।

কার্তিক ব্রতের কথায় বলা হয়েছে কার্তিক সংক্রান্তি যে দিনটিতে রবি সংক্রমণ হয় ব্রত পালন করতে হয় সেই সন্ধ্যায়। এই ব্রতের সংকল্পে হয় ‘সৎপুত্রোৎপত্তি--- প্রতিবন্ধকীভূতাশেষারিস্ট প্রশমনপূর্বক।’ সৎপুত্র কামনায় এই ব্রত।

অষ্টাদশ পদ্মের ওপর পঞ্চশস্য ছড়িয়ে বসানো হয় কার্তিকের ঘট। পুজোর সময় কার্তিকের ধ্যানে বলা হয় ‘কার্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরিসংস্থিতম্‌। তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভ শক্তিহস্তম্‌ বরপ্রদম্‌’। কার্তিকের প্রণাম মন্ত্রে তাঁকে শিখিবাহন, রুদ্রপুত্র, তারকান্তক, পিতামাতা সদাপ্রিয়, দেবতাদের যজ্ঞরক্ষাকারী পার্বতী নন্দন হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

এরপর ত্রিশূল, লৌহ খড়্গ, সর্প, অগ্নি, মাতৃকাগণের পুজো করা হয়। পুজো শেষে শুনতে হয় কার্তিকেয় ব্রত কথা। স্কন্দ পুরাণে উল্লেখিত এই ব্রতকথায় আছে, বসুদেবের জিজ্ঞাসার উত্তরে দেবর্ষি নারদ জানান, প্রাচীনকালে এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ দম্পত্তি ছিল। তাঁরা ছিলেন অপুত্রক। মনের দুঃখে ব্রাহ্মণ বনে চলে যান। সঙ্গে যান তাঁর স্ত্রীও। সেখানে থাকার সময় একদিন এক সরোবরের তীরে কিছু সধবাকে পূজানুষ্ঠান করতে দেখে ব্রাহ্মণী জিজ্ঞেস করেন, তাঁরা কী করছেন। উত্তরে তাঁদের কাছ থেকে কার্তিক ব্রতের কথা জানতে পেরে তিনিও ওই ব্রত করে পুত্রলাভ করেন।

কার্তিক পুজোর সঙ্গেই হয় ভুল ওড়ানো অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে অনেকটা চাঁচরের ন্যাড়া পোড়ার মতো একটি খড়ের মূর্তি তৈরি করা হয়। তার মাথার দিকে উড়িধানের কুটো এবং খলসে মাছ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সেটি বাড়ির দক্ষিণ দিকে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ওই মূর্তি পোড়ানোর সময় ছড়া কেটে বলা হয়,—

উড়ির কুটা খালিসার মুড়া।
ভুল যান দক্ষিণ মুড়া।।

অ্যালঝাইমার বা স্মৃতি বিভ্রম থেকে মুক্তি পাওয়ায় এ এক আকুল প্রার্থনা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সব মিলিয়ে বলা যায় কার্তিক পুজো ব্রত ভারতের সমন্বয়ী চিন্তাধারারই একটি অনন্য প্রকাশ। ■

বিবেকানন্দ সেবা ও শিক্ষা বিকাশ সঙ্ঘ পরিচালিত

স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির (উচ্চ বিদ্যালয়)

(School Code-362 of D.S.E., WB)

সিউড়ী সরস্বতী শিশুমন্দির (প্রাথমিক বিদ্যালয়)

(Code No. 19080502302 of D.I.S.E.)

এবং

বিবেকানন্দ শিশুতীর্থ ছাত্রাবাস

(ছাত্রছাত্রী উভয়ের জন্য আলাদা ব্যবস্থা)

ভর্তির জন্য আবেদনপত্র ও প্রস্পেক্টাস সংগ্রহ করতে হবে।
এজন্য ১৫০ টাকা Demand Draff Birbhum Vevekananda Seva-O-Seksha Vekash Sangha এর নামে কেটে অথবা উক্ত সঙ্ঘের নামে Indian Bank, Swci Branch, A/c. No. 6138735800-তে Deposit করার পর এসএমএস করে নাম-ঠিকানা, ফোনে অথবা নীচের ঠিকানায় পত্র মারফত জানাবেন।
সম্পাদক, বীরভূম বিবেকানন্দ সেবা ও শিক্ষা বিকাশ শিশুমন্দির ভবন
বিবেকানন্দপল্লী, সিউড়ী, বীরভূম
Phone No. 9232685987/9091102646/9474614428

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

জর্জেস ইফ্রা : (১৭৪৭)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন ফ্রান্সের অন্যতম গণিতবিদ্যার ইতিহাসকার। তাঁর বিখ্যাত পুস্তকের নাম হলো, 'দ্য ইউনিভার্সাল হিস্ট্রি অব নাম্বারস্'।

উদ্ধৃতি : এখন এটা স্পষ্ট হয়েছে আমরা এই (ভারতের) গৌরবান্বিত সভ্যতার কাছে কীরকম গভীর ঋণে আবদ্ধ, শুধুমাত্র গণিতের ক্ষেত্রেই নয় (যাতে করে সংখ্যাতত্ত্বের সাংকেতিক চিহ্নগুলি আবিষ্কার করে), ভারতীয় পণ্ডিতরা গণিতের দ্রুত বিকাশ এবং বিজ্ঞানের অসামান্য উন্নতি সাধান করেছিল। তাঁদের অক্ষয় আবিষ্কারের পিছনে ছিল তাদের বিমূর্ত বিষয়ের উপর চিন্তা করার অসাধারণ ক্ষমতা। সেইসব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের প্রেক্ষাপটে কিন্তু ছিল দর্শনশাস্ত্র, ধর্মীয়, মহাজাগতিক অতিন্দ্রীয়বাদ, পৌরাণিক এবং আধ্যাত্মিক চেতনা।

উৎস : দ্য ইউনিভার্সাল হিস্ট্রি অফ্ নাম্বারস্—জর্জেস ইফ্রা।

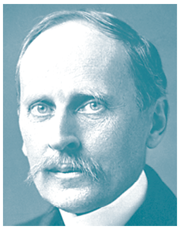

রোমাঁ রোলাঁ : (১৮৬৬-১৯৪৪)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন বিখ্যাত ফরাসি লেখক, সাহিত্য সমালোচক, নাট্যকার ও ইতিহাসবিদ। তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর রচনাগুলি পরবর্তীকালে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগ্‌মুন্ড ফ্রয়েডকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

উদ্ধৃতি : হিন্দুধর্মে ধর্মীয় বিশ্বাস কখনই বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যায়নি। তাছাড়া পূর্বোক্ত ধর্মবিশ্বাস ও ধর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে কখনও কোনো শর্ত রাখেনি এবং একথাও বলা হয়েছে বিবেকের সঙ্গে অত্যন্ত বিবেচনা করে যে, অজ্ঞেয়বাদী বা আস্তিকরাও নিজস্ব পথে একদিন পরম সত্যের সন্ধান ঠিক পেয়ে যাবে।

উৎস : বিবেকান্দ—রোমাঁ রোলাঁ।

হেনরিক হেইন : (১৯৯৭-১৮৫৬)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন জার্মানির অন্যতম রোমান্টিক কবি, প্রাবন্ধিক এবং সাংবাদিক। তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ গীতি কবিতাগুলির জন্য। তাঁর লেখা জার্মান সাহিত্য, দার্শনিক এবং রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে পাওয়া যায় এক অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি এবং ভবিষ্যদ্বাণীর নির্দেশ।

উদ্ধৃতি : পর্তুগিজ, ডাচ এবং ব্রিটিশরা জাহাজ ভরে বছরের পর বছর ধরে ভারতের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেছে। আর আমরা জার্মানরা তা দেখেছি বহু বছর ধরে। অন্যদিকে জার্মানরা ভারতের আধ্যাত্মিক জ্ঞানভাণ্ডার লুণ্ঠন করেছে।

উৎস : ইস্টার্ন রেলিজিওন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন থট—সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন।

প্রফেসর এফ. ম্যাক্স মুল্যার : (১৮২৩-১৯০০)

উদ্ধৃতি : যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয়, পুরাকালে এই পৃথিবীতে কাদের মানবিক চেতনা সবথেকে বেশি বিকশিত হয়েছিল, কারা মানব জীবনের সব থেকে জটিল সমস্যাগুলির বিষয়ে চিন্তা করতে পেরেছিল, কারা তার অনেক সমাধানসূত্রই খুঁজে বের করতে সমর্থ হয়েছিল, এমনকী যারা প্লেটো এবং কান্ট পড়েছে তাদেরও একই অভিমত হবে যে, তাঁরা হচ্ছেন প্রাচীন ভারতের মহান ঋষিকুল। এবং আমি যদি নিজেকে প্রশ্ন করি, আমরা যারা গ্রিক এবং রোমান ভাবনার সঙ্গে সুপরিচিত অথবা সেমিটিক জাতি অর্থাৎ ইহুদিদের সম্বন্ধে যারা জানি, আমরা কোন দেশের ধর্মগ্রন্থ বা দর্শনশাস্ত্র পড়ে জানতে পেরেছিলাম, যে শাস্ত্র পরে মানুষের অন্তর্জীবন আরও পরিপূর্ণ, সার্বজনীন এবং সর্বাঙ্গীণ হতে পারে, তাহলে আমাকে আবারও স্বীকার করতে হবে যে, ভারতবর্ষই হচ্ছে সেই গৌরবের অধিকারী এক মহান দেশ।

উৎস : অ্যারিয়ান, জিয়ুস, ব্রাহ্মিন্‌স ঃ থিওরাইজিং অথরিটি থ্রু মিথ্‌স অব আইডেন্টিটি—মাটিল্ডা ফিগুয়েরা।

রানি ফ্রেডেরিকা : (১৯১৭-১৯৮১)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন গ্রিস সম্রাট পলের সহধর্মিণী। তিনি ছিলেন পদার্থবিদ্যার গবেষিকা এক বিদূষী নারী।

উদ্ধৃতি : সেইসব ভারতীয়রা সত্যই ভাগ্যবান যাঁরা প্রাচীন ভারতের সেই মহান প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁরা সত্যিই আমার ঈর্ষার পাত্র। যদিও গ্রিস আমার শরীরের জন্মভূমি কিন্তু আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি ভারতই আমার আত্মার জন্মস্থান।

উৎস : কালিফোর্নিয়ার কাঞ্চী কামকোটির সংবাদপত্রিকা এবং 'দ্য নিউ ফিজিক্স টু হিন্দুইজম' নামক পুস্তক থেকে নেওয়া।

উদ্ধৃতি : আমি পদার্থবিদ্যার উচ্চ গবেষণা করছিলাম কিন্তু সেখান থেকেই আমার আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান শুরু হয়ে যায়, যার চূড়ান্ত পরিণতি হয় শঙ্করের অদ্বৈতবাদে পৌঁছে যাওয়া যা আমার সারা জীবনের দর্শন ও বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উৎস : কালিফোর্নিয়ার কাঞ্চী কামকোটির সংবাদপত্রিকা এবং 'দ্য ফিজিক্স টু হিন্দুইজম' নামক পুস্তক থেকে নেওয়া।

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁউলি।
সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী,
নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)

দেশের সব চাইতে কমবয়সি মহিলা পঞ্চায়েত প্রধান হিমাচলের জাবনা চৌহান

সুতপা বসাক ভড়

পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ নেই, যা মেয়েরা করতে পারে না। এমনই একটি মেয়ে জাবনা চৌহান। হিমাচল প্রদেশের প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে জাবনার গ্রামের বাড়িতে বসে কেবলমাত্র ঘরের মধ্যেই জীবন কাটিয়ে দেওয়ার ভাবনা ছিল না। সে পড়াশুনা করে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। নিজের এবং গ্রামের অন্য মেয়েদের জন্য কিছু কাজ করার অদম্য বাসনা ছিল তার মধ্যে। আজ মাত্র তেইশ বছরের জাবনা দেশের সব থেকে কমবয়সি পঞ্চায়েত প্রধান। ২০১৬ সালে সাড়ে বাইশ বছরের জাবনা হিমাচল প্রদেশের মণ্ডী জেলার থাজুন গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হয়। নিজের দৃঢ় ইচ্ছা এবং কর্মকুশলতার জন্য আজ সে গ্রামের মধ্যে নেশামুক্তি এবং অন্যান্য কু-অভ্যাস নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জাবনার জীবন সংঘর্ষময়। বাবা কৃষক এবং ভাই অন্ধ। বাড়ির আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল না— সেজন্য উচ্চশিক্ষার জন্য বড় শহরে যাবার প্রশ্নই ওঠেনি। গ্রামের মেয়েদের নিকটবর্তী ছোট শহরে পড়তে যাবার প্রথাও ছিল না। অভিভাবকদের অসহযোগিতা সত্ত্বেও জাবনা মণ্ডীর ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হয়। প্রতিদিন ১৮ কিলোমিটার পাহাড়ি রাস্তা হেঁটে এবং খানিকটা বাসে— এই ভাবে বাড়ি থেকে কলেজ যাতায়াত করত সে। অনেকসময় সারাদিন খাওয়াও হতো না। তা সত্ত্বেও সে পড়াশুনা চালিয়ে গেছে। তিন বছর ধরে এই ভাবে পড়াশুনা করেছে সে। এরপর একটি সংবাদপত্রের অফিসে টাইপিং শেখে এবং সেখানেই পার্টটাইম একটি কাজ পেয়ে যায়। কিছুদিন পরে সে স্থানীয় একটি সংবাদ চ্যানেলে কাজ করতে আরম্ভ করে। এসবের মধ্যেও সে তার থাজুন গ্রামকে ভোলেনি। গ্রামের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে তার সমাধানের সূত্র

বের করার চেষ্টা সে অনবরত করে গেছে।

জাবনা জানিয়েছে যে সে কোনোদিন রাজনীতিতে যোগদানের কথা ভাবেনি, কিন্তু গ্রামে যখন পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হয়েছিল, তখন গ্রামবাসীদের ঐকান্তিক আবেদনে সাড়া দিয়ে সে মনোনয়ন পত্র দাখিল করে। তার উদ্দেশ্য ছিল, গ্রাম থেকে নেশা এবং অশিক্ষা দূর করা; কিন্তু কিছু লোক তাকে নিরুৎসাহিত করে, কটূক্তি এবং হুমকিও দিয়েছিল। ইতিমধ্যে জাবনা মনস্থির করে ফেলে। তার বাবাও সাহায্য করেন। আধুনিক শিক্ষার আলোয় আলোকিত জাবনা হোয়াটস্‌অ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে যুবক এবং মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তাদের মতামতও নেয়। হিমাচল প্রদেশের ওইসব প্রত্যন্ত গ্রামে ভোটের আগে গ্রামবাসীদের মদ খাইয়ে খুশি করার প্রচলন আছে। এ ব্যাপারে জাবনা স্পষ্টভাবে তার গ্রামবাসীদের জানিয়ে দেয় যে, সে এই কুপ্রথার পুনরাবৃত্তি করবে না। ভোটের ফল বেরোলে দেখা যায় নির্বাচনে পাঁচজন প্রার্থীর মধ্যে সর্বাধিক ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে জাবনা। জাবনার বক্তব্য, নেশা কেবলমাত্র তার গ্রামেই নয়, সমগ্র দেশের একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকাল কিছু লোকের শখ শৌখিনতাতেও এটি ঢুকে পড়েছে। তা সত্ত্বেও এর সমাধান আছে। যদি সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ একসঙ্গে এই সমস্যার মোকাবিলা করে, তবে এর থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। বর্তমানে জাবনার গ্রামে মদ্যপান নিষিদ্ধ। বিবাহাদি অনুষ্ঠানে বা প্রকাশ্য স্থানে যদি কেউ মদ্যপান করে, তবে তাকে জরিমানা দিতে হবে। একজন সংবেদনশীল এবং দায়িত্বশীল পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে সে জানায় যে, বাইরের দূষণের থেকেও আমাদের মানসিক দূষণ অনেক বেশি সাঙ্ঘাতিক— এই মানসিক দূষণ দূর করাকেও সে তার কর্তব্যের মধ্যে নিয়েছে। এছাড়া তার কর্মতালিকার মধ্যে স্থান পেয়েছে মেয়েদের জন্য কলেজ বানানো, গ্রামকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, গ্রামবাসীদের প্রাথমিক প্রয়োজন যেমন জল এবং বিদ্যুতের সরবরাহ ইত্যাদি। স্থানীয় প্রশাসন তার এই সদুদ্দেশ্যে সাহায্য করছে। নিজস্ব কার্য পদ্ধতিতে অবিচল জাবনা যুবশক্তিকে সমাজ এবং দেশের জন্য পৃথকভাবে কিছু ভাবতে এবং করতে আহ্বান জানিয়েছে।

জাবনার বয়স এবং অভিজ্ঞতা কম, কিন্তু তার ঐকান্তিক সদিচ্ছা এবং কর্মকুশলতার জন্য তার গ্রাম থাজুন এই পদক্ষেপকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছে এবং তাকে তার উদ্দেশ্যে সফল হবার জন্য সমর্থন করেছে। নিজের গ্রাম, সমাজ এবং দেশের উন্নতিকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাবনা চৌহানের জন্য রইল আমাদের শুভেচ্ছা। সমাজের মঙ্গলার্থে তার কর্মযজ্ঞ সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠুক এই কামনা করি। ■

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গান্ধীজী

বিমলেন্দু ঘোষ

গত ১০ জুন ছত্তিশগড়ে লেখক, বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এক আলোচনাসভায় বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, 'কংগ্রেস কোনও নীতিনিষ্ঠ বিচারধারার দল ছিল না। স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্যে সম্মিলিত ভাবে লড়াই করার প্ল্যাটফর্ম তথা স্পেশাল ভেহিকল বা সংস্থা হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছিল। গান্ধীজী একজন চতুর বানিয়া ছিলেন। তিনি আগেই বুঝেছিলেন, স্বাধীনতার পরও কংগ্রেস টিকে গেলে কী কী হতে পারে। তাই, স্বাধীনতার পরেই তিনি কংগ্রেসকে ভেঙে দিতে বলেছিলেন'। অমিতজীর মূল বক্তব্যের ধারেকাছে না গিয়ে 'চতুর বানিয়া' কথাটি নিয়ে গান্ধী-অনুরাগী মহল প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। যেমন, গান্ধীজীর পৌত্র পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী 'চতুর বানিয়া' কথাটি অরুচিকর বলে মন্তব্য করেছেন। ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গান্ধীজীর অপর এক পৌত্র রাজমোহন গান্ধী বলেছেন— যিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়েছিলেন এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষধর সাপকে জয় করেছিলেন, তিনি 'চতুর বানিয়া' থেকেও আরও বেশি কিছু। কংগ্রেস থেকে দাবি করা হয়েছে, যে মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করে গিয়েছেন 'বানিয়া' বলে উল্লেখ করে তাঁকে অপমান করা হয়েছে। অমিত শাহ এবং নরেন্দ্র মোদীর উচিত দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়া। সংবাদপত্র সূত্রে জানা যায়, ঘরোয়া মহলে বিজেপির কিছু নেতা বলেছেন, অমিতজী ভুল কিছু বলেননি। গুজরাটে এধরনের কথার চল আছে। হতেই পারে; একটা চলতি কথা আছে— 'এক জায়গার বুলি, অন্য জায়গায় গালি'। ৩ জুলাই স্বস্তিকার অতিথি কলমে আকর প্যাটেল বিশদভাবে বলেছেন, গুজরাটিদের কাছে 'চতুর বানিয়া' সম্বোধন আদৌ অপমানজনক নয়। সুতরাং 'চতুর বানিয়া' কচকচিতে না ঢুকে বরং কংগ্রেসিদের গান্ধীস্তুতি প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু কথা বলা যাক।

অধ্যাপক রাজমোহন গান্ধী মনে হয় জানেন না, ১৯২২ সালের প্রথমার্ধে ফরাসি লেখক এম পল রিচার্ডকে গান্ধীজী এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন— 'আমি ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করি না, আমি কাজ করি বিশ্বে অহিংসা প্রতিষ্ঠার জন্য।... তিলক আমাকে বলেছিলেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য আমি সত্যকে ত্যাগ করতে রাজি আছি, কিন্তু আমি সত্যের জন্য দেশের স্বাধীনতাকে বলি দিতে রাজি'— (দ্র: মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী : একটি অকপট জীবনী— রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, সতেরো অধ্যায়)। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের খসড়া প্রস্তাবে স্বাধীনতার দাবি ছিল না; বিজয় রাঘবাচারির দাবি এবং তা মতিলাল নেহরুর সমর্থন গান্ধীজীকে তাঁর প্রস্তাবে স্বাধীনতার দাবি অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছিল (...Pandit Motilal Nehru also wanted the demand to be included in the resolution. I readily acceptes the suggestion in my resolution."— 'My Experiments with Truth' p. 630)।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই গান্ধীজী বলেছিলেন— 'ব্রিটেনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে আমরা আমাদের স্বাধীনতা চাই না। এটা অহিংসার পথ নয়।' ১৯৪০ সালের ১৭ অক্টোবর থেকে গান্ধীজী এক সীমিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। ওই আন্দোলনের একমাত্র দাবি ছিল, 'বাক্-স্বাধীনতা'; প্রকাশ্যে এই কথা বলার অধিকার যে, ভ্রাতৃঘাতী এই মহাসমর আমি সমর্থন করি না। ("...the liberty of going through the streets of Bombay and saying that I shall have nothing to do with this war, because I do not believe in this war and in fratricide that is going on in Europe."

আজকের যে কংগ্রেসিরা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন নিয়ে গর্ব করে বেড়ান তাঁদের হয়তো জানা নেই যে, ওই আন্দোলনকে বিপথগামিতা ('aberrations') বলে উল্লেখ করে কলকাতায় ১৯৪০ সালের ১১ ডিসেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব নিয়েছিল— '...নেতৃত্বহীন জনগণ কিছু কিছু বীরত্বপূর্ণ কাজ করলেও '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনকে কোনো ভাবেই সমর্থন করা যায় না। এর কারণ, এই আন্দোলন ছিল হিংসাত্মক, অহিংস নয়।' প্রস্তাবে, ১৯২০ সাল থেকে অনুসৃত অহিংস আন্দোলন পদ্ধতিকেই কংগ্রেসের দিশা হিসাবে আবার ঘোষণা করা হয়। একথা অনস্বীকার্য, গান্ধীজীর অভূতপূর্ব অসহযোগ আন্দোলন আপামর দেশবাসীর অন্তরে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারিত করেছিল। কিন্তু গান্ধীজী ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়েছিলেন বলে দাবি সত্যের অপলাপ। একথা ভুললে চলবে না যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন অগ্নিযুগের বীর বিপ্লবী সৈনিকেরা এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ যে চরম ধাক্কা দিয়েছিল তা সামলে ওঠার শক্তি ব্রিটিশ রাজশক্তির ছিল না। তাঁদের কথা ভুলে গেলে তাঁদের তুলনাহীন দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের অবমাননা করা হবে এবং সেই সঙ্গে ইতিহাসকে অস্বীকার করা হবে।

প্রসঙ্গত, আর একটি কথা। বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে (জুলাই, ১৮৯১) গান্ধীজী ১৮৯৩ সালের এপ্রিলে দাদা আবদুল্লা অ্যান্ড কোম্পানির কাজ নিয়ে এক বছরের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেন। গান্ধীজীর কথায় 'ব্যারিস্টারি করা নয়, কারবারের চাকুরে হিসাবে'। কোম্পানির কাজ বছর খানেকের মধ্যে শেষ হয়ে গেলেও ঘটনাচক্রে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় আরও ২১ বছর থেকে যান। তাঁর 'আত্মকথা' থেকে জানা যায়, নাটালে থাকতে যে সব সভায় তিনি যোগ দিতেন, সেসব সভার শেষে ব্রিটিশ জাতীয় সঙ্গীত 'গড সেভ দি কিং' গাওয়া হতো। সেই সমবেত সঙ্গীতে যোগদান করা তিনি অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করতেন। বহু অধ্যবসায়ে তিনি ব্রিটিশ জাতীয় সঙ্গীতের সুরটুকু আয়ত্ত করেছিলেন। ভারতে ফিরে এসে গান্ধীজী ৫০ বছর বয়সে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। জাতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর কার্যকাল বছর পঁচিশ।

স্তনের রোগ এড়াতে সাবধানতা

ডাঃ ইন্দ্রনীল চৌধুরী

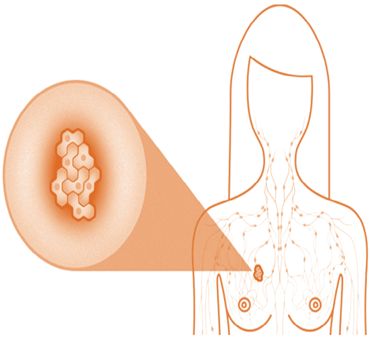

প্রত্যেক নারীই স্তন ক্যানসারের ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করেন। বিশ্বে প্রতি ১৬ জন নারীর একজনের জীবনের যেকোনো সময় স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। উন্নত বিশ্বে তো বটেই, ভারতবর্ষের নারীরাও এই ঝুঁকির বাইরে নন। তাই এখনই সময় সচেতন হওয়ার ও রোগ প্রতিরোধের। আর অন্য সব রোগের মতোই এখানেও সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হলো, দেরিতে রোগ শনাক্ত হওয়া এবং এ কারণে চিকিৎসা গ্রহণে পিছিয়ে পড়া। তাই বিশ্বজুড়ে গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক স্ক্রিনিং সিস্টেম। গড়ে উঠছে একই সেন্টারে একাধিক সেবা মেলে এমন মাল্টিডিসিপ্লিনারি ডায়াগনস্টিক টিম, যেখানে থাকবেন রেডিওলজিস্ট, ব্রেস্টসার্জন, রেডিওথেরাপিস্টরাই। গড়ে উঠেছে নারীদের জন্য ভয়ানক এই ঘাতককে রোখার ও এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, গাইডলাইন ও সরকারি আইনকানুন।

৩৫ বছর পার হয়ে গেলেই নিজের স্তন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে প্রত্যেক নারীকে। নিজেকে নিজে পরীক্ষা করা এবং স্তন ক্যানসারের লক্ষণগুলো সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকা হচ্ছে এই সচেতনতার প্রথম ধাপ। জেনে নেওয়া দরকার স্তন ক্যানসারের ঝুঁকিগুলো সম্পর্কেও। পরিবারে কারও স্তন ক্যানসারের ইতিহাস, অত্যধিক ওজন, মন্দ খাদ্যাভ্যাস, হরমোন ট্যাবলেট সেবনের ইতিহাস, ঋতুচক্রের ইতিহাস এগুলো জানা জরুরি। এর আগে স্তনে কোনো সমস্যা হয়েছিল কি না বা কোনো পরীক্ষা, যেমন ম্যামোগ্রাফি করা হয়েছিল কিনা জানা দরকার। এরপর দরকার একটি সার্বিক ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট। স্তনে যেকোনো সমস্যা বা সন্দেহজনক পরিবর্তনে প্রথমেই শরণাপন্ন হতে হবে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের। তিনি পূর্ণভাবে দুটি স্তন ও দুটি বগল পরীক্ষা করবেন। যেকোনো সন্দেহজনক পরিবর্তন দেখলে তিনি শরণাপন্ন হবেন ল্যাবরেটরি পরীক্ষার।

যদি ক্যানসার ধরা পড়ে, তবে তা স্তনের কতটুকু দখল করে আছে, অন্য স্তন বা আশেপাশের গ্রন্থিগুলোর অবস্থা কী, কতটুকু ক্ষতি হয়েছে এবং টিউমারের নিরাপদ সীমানা কতটুকু এসব জটিল বিষয় বিবেচনায় এনে সার্জারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে। এত দিন স্তনের সার্জারি বলতে মাসটেকটমি (সম্পূর্ণ স্তন অপাসারণ), র‍্যাডিকাল মাসটেকটমি (স্তনসহ গ্রন্থিগুলোর অপসারণ), ব্রেস্ট কসার্ভি সার্জারি (স্তন সংরক্ষণ সার্জারি) প্রভৃতিকেই বোঝাত। কিন্তু এখন আধুনিক বিশ্বে চলে এসেছে অনকোপ্লাস্টিক টেকনিক। এই পদ্ধতিতে তিন থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার আকারের টিউমারও নিরাপদে স্তন সংরক্ষণ করেই অপসারণ করা সম্ভব। এছাড়া সার্জারি ও রেডিওথেরাপির পর বিকৃতি রোধ করতে বরিউম রিপ্লেসমেন্ট সার্জারির সাহায্য নেওয়া হয়। তবে আধুনিক অনকোপালাস্টিক টেকনিক একই সঙ্গে ক্যানসার অপসারণ ও রিকনস্ট্রাকশন বা বিকৃতি রোধের সুযোগ এনে দিয়েছে।

সংকোচ ও অবহেলা নারীকে নিজের স্তন বিষয়ে কুণ্ঠিত করে রাখে। নিজের সমস্যাগুলো গোপন করা, প্রকাশ করতে দেরি করা বা প্রকাশ করলেও পরিবারের উদাসীনতা নারীকে ঠেলে দেয় নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। যে রোগের চিকিৎসা আশাপ্রদ ও সহজসলভ্য, সে রোগটি ভয়ঙ্কর ঘাতকরূপে দেখা দেয়। তাই স্তন ক্যানসার ঠেকানোর প্রথম পদক্ষেপেই হলো সচেতনতা। নারীরা নিজের সম্পর্কে সতর্ক হোন, নারী সম্পর্কে অন্য সবাই সচেতন হোন।

স্নানের সময় মাসে অন্তত একবার হাত দিয়ে স্তন ও বগল পরীক্ষা করার সময় : যদি হাতে কোনো চাকা অনুভব করা যায়। এর আগে স্তনে টিউমারের চিকিৎসা হয়েছে এমন কারও নতুন করে আবার কোথাও চাকা দেখা দিলে। চাকাটি খুব দ্রুত বড় হতে থাকলে। চাকাটি যদি স্তনের চামড়া বা স্তনবৃন্তের সঙ্গে ঘনভাবে সন্নিবেশিত থাকে। দুই স্তনের আকার ও আকৃতিতে অস্বাভাবিক গরমিল দেখা দিলে। পর পর দুটি মাসিকের পরও স্তনের চাকা চাকা ভাব অনুভূত হতে থাকলে। স্তনের সিস্ট ঘন ঘন দেখা দিলে। ফোঁড়া বারবার হতে থাকলে— চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

শুধু ব্যথা কোনো দুশ্চিন্তার বিষয় নয়, কিন্তু এর সঙ্গে চাকা, বিকৃতি বা যেকোনো ধরনের অস্বাভাবিকতা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। মেনোপজের পর কোনো নারীর এক পাশে অস্বাভাবিক ও স্থায়ী ব্যথা। যে তীব্র ব্যথা সাপোর্টিভ ব্রা বা ব্যথানাশক খেলেও দূর হচ্ছে না। স্তনবৃন্তের অস্বাভাবিকতা স্তনবৃন্ত থেকে রক্তক্ষরণ। দীর্ঘস্থায়ী অ্যাকজিমা বা ক্ষত। স্তনবৃন্ত ভেতর দিকে ঢুকে যাওয়া, দেবে যাওয়া বা এক পাশে সরে যাওয়া ইত্যাদি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে অবহেলা করবেন না।

(স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ) মো: ৯০০৭১৯১৮৭৩

চাষে লাভ নেই, বাংলার চাষি এখন থিম পুজোর শিল্পী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ওরা আর বীজ বোনেন না। লাঙলের মুঠা ধরে বলদের পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে বাপঠাকুরর্দার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমি চাষ করা ছেড়ে এখন ওরা শিল্পী। মণ্ডপশিল্পী। দুর্গাপুজোর সময় কলকাতার বিখ্যাত থিমের পুজো ওদের বাদ দিয়ে চলে না। বেশিরভাগই আসেন পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে। কেউ কেউ দুই চব্বিশ পরগনা এবং নদীয়া থেকে।

এদের একজন গৌরাঙ্গ কুইলা। নিবাস পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিরিঞ্চিভাসান গ্রামে। তার নামটি বলার সময় মণ্ডপ-শিল্পীদের মাথা আপনা থেকেই ঝুঁকে পড়ে। অথচ গৌরাঙ্গবাবুর কোনও প্রথাগত শিক্ষা নেই। স্বশিক্ষিত শিল্পী। জন্ম একটি হতদরিদ্র চাষি পরিবারে। বাড়ির সবাই চেয়েছিলেন বংশের ধারা মেনে তিনিও চাষাবাদ নিয়ে থাকুন। ছিলেনও তাই। কিন্তু বেশিদিন সইল না। গৌরাঙ্গবাবু বলেন, ‘মণ্ডপের কাজ শুরু করার আগে আমি দীর্ঘদিন বাবা-কাকা, ভায়েদের সঙ্গে চাষের কাজ করেছি। কিন্তু চাষ করতে আমার ভালো লাগত না। আমি আঁকাজোকা নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম।’

ছেলেবেলা থেকেই গৌরাঙ্গবাবুর চমৎকার আঁকার হাত। সেইসঙ্গে ছিল ছোটখাটো মোটিফ তৈরির নেশা। পাড়া-প্রতিবেশী কিংবা আশেপাশের গ্রামের মানুষ তার হাতের কাজ দেখে মুগ্ধ হতেন। শিল্পের রাজপথে তার প্রথম পা পড়ল ২০০২ সালে। পেলেন হস্তশিল্পে জাতীয় পুরস্কার। না, আর পিছনে তাকাতে হয়নি। সে বছরই কলকাতার নামকরা চারটি ক্লাবের দুর্গাপুজোর মণ্ডপ নির্মাণের ডাক পান গৌরাঙ্গবাবু এবং তার দেড়শো জনের দল। ক্লাবগুলি হলো বড়িশা ক্লাব, ৪১-র পল্লী, মুদিয়ালি এবং ত্রিধারা সম্মিলনী।

গৌরাঙ্গ কুইলা

সাফল্যের শব্দ আছে। ছবিও আছে। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়ে। নিজের গ্রামে তো বটেই, আস্তে আস্তে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে গৌরাঙ্গ কুইলা হয়ে উঠলেন পথিকৃৎ। তাঁর রাস্তায় এতদিন তিনি ছিলেন একলা পথিক, এবার এগিয়ে এলেন অনেকেই। এদের মধ্যে রয়েছেন ছাব্বিশ বছরের কার্তিক কুইলা এবং পঁয়তাল্লিশ বছরের তপন বেরা-সহ আরও অনেকে। তপন বেরা বলেন, ‘আমাদের এই নতুন জীবনের কারিগর হলো গৌরাঙ্গ। ওর জন্যেই আমরা সাধারণ ভাগচাষি থেকে শিল্পী হতে পেরেছি।’

কৃষিশ্রমিক থেকে শিল্পীতে রূপান্তরিত আর-এক শিল্পী বিশ্বজিৎ মাহাতের গল্প একটু অন্যরকম। নবদ্বীপের বাসিন্দা এই মানুষটির কাছে সব থেকে দামি হলো মানসম্মান। বিশ্বজিৎ বলেন, ‘কৃষিশ্রমিকের কাজে না আছে সম্মান, না আছে টাকা।’ মণ্ডপসজ্জা এবং মূর্তিগড়ার কাজ তিনি শিখেছেন বাবার কাছে। প্রতি বছর পুজোর সময় তিনি কলকাতায় চলে আসেন। সঙ্গে থাকে ন'জন শিল্পীর দল। দু'মাসে পাঁচটি মণ্ডপের কাজ করে তারা আবার গ্রামে ফিরে যান।

গরিব শিল্পীদের কাছে দুর্গাপুজো হলো তাদের শিল্পদক্ষতা প্রকাশ করার মস্ত বড়ো ক্যানভাস। এ সময় শুধু যে তাদের রোজগার বাড়ে তা নয়, কাজ মানুষের পছন্দ হলে গ্রামে ফিরে যাওয়ার পর মেলে নায়কের সম্মান। গৌরাঙ্গ কুইলা জানালেন, ‘সারা বছর চাষ করে আমরা যা রোজগার করি তার থেকে অনেক বেশি করি পুজোর ওই দু'মাস।’

তিন শিফটে কাজ হয় পুজোয়। গড়পড়তা শিল্পীদের দৈনিক রোজগার ১৫০০ টাকা। উঁচুদরের শিল্পী হলে মণ্ডপ পিছু পারিশ্রমিক ২ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করে। অন্যদিকে, বছরে তিনবার চাষ করেও ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকার বেশি লাভের মুখ দেখেন না চাষিরা। একজন কৃষিশ্রমিক সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে মজুরি পান মাত্র ১২০ টাকা।

তপন বেরা বলেন, ‘যুগ যুগ ধরে কৃষি ছিল আমাদের প্রধান পেশা। কিন্তু এখন অতিরিক্ত আয়ের একটা রাস্তা ছাড়া আর কিছুই নয়।’ তপন মণ্ডপ নির্মাণের পাশাপাশি পাটের উপহার সামগ্রী তৈরি করা শুরু করেছেন। যা থেকে তার মাসিক রোজগার ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা। মেলার সময় এই রোজগার দ্বিগুণ হয়ে যায়।

এরা সকলেই গৌরাঙ্গ কুইলাকে গুরু মানেন। তিনি পথ দেখিয়েছেন। অনিশ্চয়তার আবর্তে পড়ে থাকা একদল অসহায় মানুষকে তলিয়ে যেতে দেননি। এর জন্য তাকে সাধুবাদ দিতেই হবে। ■

ভারোত্তোলনই আমার অন্তরের শক্তি : কৌস্তুভ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্গাপুরের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে কৌস্তুভ ঘোষের দেহ-মন জুড়ে রয়েছে পাওয়ার লিফটিং বা ভারোত্তোলন। ব্যায়ামাগারে গিয়ে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা নিয়ম করে শক্তিনির্ভর ব্যায়াম এবং ওজন উত্তোলন করাকে ঐশী সাধনা বলে মনে করেন। আর সেই সাধনার ফলও পাওয়া যাচ্ছে হাতে-নাতে। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে কমনওয়েলথ পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করেছেন কৌস্তুভ। এক টেলিফোন কথপোকথনে অকপটে জানালেন তাঁর মনের কথা স্বস্তিকার প্রতিনিধিকে।

□ এতসব খেলা থাকতে পাওয়ার লিফটিং কেন?

● অন্যসব খেলায় শরীর মনের যতটা সমন্বয় ঘটে, তারচেয়ে পাওয়ার লিফটিংয়ে একটু বেশিই প্রতিফলিত হয় এই ব্যাপারটা। প্রচণ্ড মানসিক দৃঢ়তা, মনঃসংযোগের সঙ্গে অসম্ভব ক্ষিপ্রতা ও শক্তির সমন্বয়ে এই খেলায় উৎকর্ষ সাধন করতে হয়। তাই বিশেষ ধরনের চ্যালেঞ্জ আছে বলেই এই খেলায় আসা।

□ পারিবারিক প্রেক্ষাপট কতটা সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে?

● আমি অতি সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসেছি। প্রথমে বর্ধমান তারপর জীবিকার তাগিদে আমার বাবা (অতি সম্প্রতি গত হয়েছেন) দুর্গাপুরে চলে আসেন। আমার প্রথাগত শিক্ষা, ব্যায়ামচর্চা, শক্তি পরীক্ষা সবই এই শহরকে কেন্দ্র করে বেড়ে উঠেছে। শক্তিচর্চার পাশাপাশি লেখাপড়াটাও মন দিয়ে করেছি ভবিষ্যত যাতে সুরক্ষিত থাকে। আমার এই চর্চার পিছনে মা-বাবার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তবে আমি শৈশবে যথেষ্ট দুর্বল ছিলাম। আমাদের পরিবারে সকলেরই কমবেশি হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যা রয়েছে। আমারও ছিল আর তা কাটিয়ে তোলার জন্য সাঁতারে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু এক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু দেখে সাঁতারের পুল ছেড়ে অ্যাথলেটিক্সে চলে আসি। শটপাট ছিল আমার ইভেন্ট। সব রাজ্যভিত্তিক ইভেন্টে শটপাটে মোটামুটি সাফল্যের রাজপথ দিয়ে হেঁটেছি। তারপর প্রকৃতির ইচ্ছেতেই বোধহয় পাওয়ার লিফটিংকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে মেনে নিয়েছি তার কারণটা আগেই উল্লেখ করেছি।

□ জুনিয়র, সিনিয়র স্তরে সাফল্যের খতিয়ান?

● ২০০৫-এ মাত্র দশ বছর বয়সে অ্যাথলেটিক্সে আসি। এর ৬ বছর পর ওয়েট লিফটিং শুরু করি। পরবর্তী ২ বছর রাজ্যস্তরে প্রায় সব প্রতিযোগিতায় প্রচুর পদক জিতেছি। এরপর গোড়ালির চোটে ওয়েট ছেড়ে পাওয়ার লিফটিংয়ে মনোনিবেশ করি। ২০১৪ থেকে ধারাবাহিক ভাবে সাফল্য আসতে শুরু করে। ওই বছর জাতীয় প্রতিযোগিতায় রুপো জিতেছিলাম। ওই সাফল্যের জেরে ২০১৫-তে কানাডায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হই। কিন্তু জঙ্গি সন্ত্রাসের কারণে প্রথম মিটে নামা হয়নি। ২০১৬ সালে রাজস্থানের উদয়পুরে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ৩টি রুপো, ১টি ব্রোঞ্জ জিততে সমর্থ হয়েছি। পরের বছর ইন্দোনেশিয়ায় অবশ্য এই প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হই কারণ উপযুক্ত সরঞ্জামের অভাবে ঠিকমতো প্রস্তুতি নিতে পারিনি। কিন্তু এই ব্যর্থতা সুদে-আসলে পুষিয়ে নিয়েছি তার কয়েকমাস পরে দক্ষিণ আফ্রিকার বাণিজ্যনগরীতে গিয়ে। সমস্তরকম প্রতিকূলতা অতিক্রম করে কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আফ্রিকার শক্তি-বীর্যে ভরপুর সমস্ত দেশের লিফটারদের সঙ্গে লড়ে প্রতিটি এক্সারসাইজে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করে পাঁচটি রুপোর পদক জিতে নিয়ে আসতে পেরেছি দেশে।

□ ভবিষ্যতে পরিকল্পনা কী? খেলাটিতে দেশের ভবিষ্যৎই বা কী?

● সামনের বছর এশিয়াড, কমনওয়েলথ গেমস আছে। পাওয়ার লিফটিংয়ের সর্বোচ্চমানের প্রতিযোগিতায় দেশের জন্য পদক জিততে যা যা করণীয় আমি সব করব। নিজের সাধ্যমতো অনুশীলনের সময়, যোগাভ্যাস চর্চা সব বাড়িয়ে দেব। সমস্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নেব যাতে বিগ ইভেন্ট টেম্পারমেন্ট ও কিলার ইনস্টিংকটকে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারি। আর এই খেলায় ভারতের ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল। মণিপুর, পঞ্জাব, রাজস্থানে দেখেছি এমন কিছু লিফটার আছে যারা বিশ্ব-আসর থেকে পদক জিতে আসতে সক্ষম। বাণিজ্যিক সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতার ও গণমাধ্যমে কভারেজ হলে প্রচুর লিফটার উঠে আসবে যারা বিদেশে দেশের পতাকাকে আরো উঁচুতে তুলে ধরতে পারে।

পরলোকে বসন্ত বিনায়ক বাপট

যাবতীয় ইহলৌকিক কর্তব্য সম্পাদনের পর গত ৩১ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তা বসন্ত বিনায়ক বাপট অমৃতলোকের পথে যাত্রা করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। শিশু স্বয়ংসেবক হিসাবে ৪ বছর বয়সে তাঁর সঙ্ঘে প্রবেশ। তারপর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সঙ্ঘকাজে আত্মনিবেদনের পর্ব, যার উৎসকেন্দ্র রূপে তাঁকে প্রেরণা দিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্ঘের অন্যতম দু'জন কার্যকর্তা— অমল কুমার বসু এবং কুশাভাউ ঠাকরে। যার পরিণাম সঙ্ঘকাজের প্রতি তাঁর গভীর নিষ্ঠা। আর সেই জন্যই তাঁর মননে ও চিন্তনে এক নতুন আত্মপ্রত্যয়ের সূচনা হয়। ১৯৪৮ সালে ইন্দোরে অধ্যয়নরত ছাত্র অবস্থায় ২০ বছর বয়সে সঙ্ঘের উপর প্রতিবন্ধকতার কারণে তিন মাসের জন্য তিনি কারাবরণ করেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এমন কোনো জীবিকার গ্রহণ করার যা তাঁকে সঙ্ঘকাজে অধিক সময় দেওয়ার সুযোগ করে দিতে পারে অর্থাৎ সঙ্ঘ কাজ তিনি যেন স্বাধীন ভাবে করতে পারেন। এই লক্ষ্যকেই সামনে রেখে তিনি ১৯৫০ সালে নাগপুরে Chartered Accountancy বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি আচার্য বিনোবা ভাবের দ্বারা পরিচালিত সেবাশ্রম আশ্রমে Articleship শুরু করেন এবং দীর্ঘকালের অবহেলায় অগোছালো হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় নথি দীর্ঘ ৮ মাস নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে সঠিক রূপে সঙ্কলিত করে, সবার কাছেই অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠেন। এইভাবেই তিনি আচার্য বিনোবা ভাবের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ হন। ১৯৫৩ সালে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে Articleship পূর্ণ করে Chartered Accountancy পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজস্ব জীবিকায় প্রবেশ করেন।

এখান থেকেই তাঁর পরিচিতির ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সূত্র ধরেই সঙ্ঘের প্রচারক এবং কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রাণপুরুষ একনাথ রাণাডে সরাসরি কলকাতায় আসার জন্য আহ্বান জানালেন বাপটজীকে। কারণ বাংলায় সঙ্ঘকাজ সুসংগঠিত করার জন্য এইরকম শিক্ষিত তরুণ স্বয়ংসেবকের সন্ধানেই তিনি ছিলেন, যিনি নিজস্ব জীবিকা স্বয়ং নির্বাহ করার পাশপাশি সংগঠনের জন্য সময় দিতে পারবেন। সেই উদ্দেশ্যেই ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বাপটজীর ইন্দোর থেকে কলকাতায় আগমন। আর সেই কলকাতাই তাঁর কর্মভূমি হয়ে উঠল। এরপরেই সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হতে শুরু করল তাঁর জীবনের দুটিধারা--- একদিকে জীবিকা, বিবাহ ও পারিবারিক কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন, অপরদিকে সমাজে বৃহত্তর ক্ষেত্রের কাজে নিজেকে যুক্ত করা। এই ভাবেই তিনি ১৯৭৯ থেকে দীর্ঘ ৩০ বছর কলকাতা মহারাষ্ট্র নিবাস ট্রাস্টি হিসাবে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে গেছেন। এমনকী ১৯৬৬ সালে স্বয়ং পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আগ্রহে তিনি ভারতীয় জনসঙ্ঘের হিসাব পরীক্ষক রূপে নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘকাল ধরে উপেক্ষিত হিসাবের যাবতীয় জটিলতাকে নির্মূল করে সমাজের সামনে জনসঙ্ঘের স্বচ্ছভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর প্রামাণিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দিয়ে গেছেন। ১৯৯৪ সালে ঘটে তাঁর পত্নীবিয়োগ, যা ছিল আকস্মিক ও অসময়োচিত। এই ঘটনার কিছুদিন পর তাঁর কাছে সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় স্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের আহ্বান আসে। সঙ্ঘের দুজন প্রবীণ প্রচারক আবাজী থাট্টে এবং কেশব রাও গোরের অনুরোধে প্রথমে অখিল ভারতীয় সহ-ব্যবস্থা প্রমুখ এবং পরে ১৯৯৮-৯৯ সালে অখিল ভারতীয় ব্যবস্থা প্রমুখের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ২০০৬ সালের পর তিনি স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন কিন্তু অব্যাহতি নেননি নিত্য সঙ্ঘস্থানে উপস্থিত হওয়া থেকে।

একজন গৃহী কার্যকর্তার পক্ষে অখিল ভারতীয় স্তরের কোনো দায়িত্ব গ্রহণ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তিনি তাঁর জীবিকা ও জীবনের সমন্বয় এমনভাবে ঘটিয়েছিলেন যে এই দুরূহ কাজকেও তিনি সহজ করে তুলেছিলেন। এটাই তাঁর জীবন থেকে আমাদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষণীয় বিষয় যার অপর নাম সময়ের সদ্ব্যবহার— Proper Time Manegement। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে এই নশ্বর দেহের অবসানলগ্নে, শ্রী বাপটজী রেখে গিয়েছেন এক পুত্র, পুত্রবধূ-সহ বহু আত্মীয়-পরিজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী। উল্লেখ্য, বাপটজীর স্বর্গীয় সহধর্মিণী বাসন্তী বাপট পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির কাজ শুরু করেন।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পলাশী শাখার স্বয়ংসেবক পলাশী খণ্ড প্রমুখ ইন্দ্রনীল ঘোষালের পিতামহ জীবনকৃষ্ণ ঘোষাল গত ২৭ অক্টোবর নিজবাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল একশো বছর। তিনি পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যার জনক ছিলেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাটোয়া জেলার কালনা নগরের বিবেকানন্দ শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক কিষাণলাল আগরওয়ালা গত ২৭ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। পুত্র ও পুত্রবধূ, কন্যা ও জামাতা এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

মশা

আমরা ছেলেবেলায় মশার বাসা খুঁজতে যেতাম। ঢেঁকি গাছে মশা বাসা করে, এই আমাদের বিশ্বাস ছিল। লাল রঙের একধরনের বড় পিঁপড়ে যেমন গাছের পাতা দিয়ে বাসা তৈরি করে, ঢেঁকি গাছে তেমনি খুব ছোট বাসা পাওয়া যায়। এগুলো কিসের বাসা, তা আমি আজও জানতে পারিনি। কিন্তু আমাদের ছেলেবেলায় এই সংস্কার ছিল যে, এগুলি মশার বাসা বৈ আর কিছুই নয়। সত্যি বলতে কী এসব বাসার প্রায় প্রতিটিতে এক-একটা করে মশা পাওয়া যায়।

যে-সকল মশা আমাদের রক্ত খেতে আসে, তারা সকলেই স্ত্রী-মশা। পুরুষ-মশা নিরীহ; তারা ফুলের মধু খেয়ে জীবন কাটায়। এদের স্ত্রী পুরুষের মুখের গঠনেরও কতকটা তফাত আছে।

ডিম পাড়বার সময় হলে স্ত্রী-মশা উপযুক্ত একটি জলাশয় খুঁজে নেয়। নির্জন পুকুরগুলো এই কাজের পক্ষে খুবই ভালো জায়গা। কিন্তু তিন-চারদিন ধরে ঝি যে জলের হাঁড়ি ঘরের কোণে রেখে দিয়েছে, তার খোঁজ পেলেও মশার মা নিতান্ত দুঃখিত হবে না। একবারে অনেকগুলো ডিম পাড়া হবে। পেছনের দু'খানা পা দিয়ে ডিমগুলোকে জড়ো করে একটা ছোট নৌকোর আকারে সাজানো হবে; এই নৌকোটা জলে ছেড়ে দিলেই সে ভাসতে থাকবে। ডিমের সরু দিকটা উপরে থাকে, কাজেই কেমন করে নৌকোর আকার হয় তা সহজেই বুঝা যাচ্ছে। সময় হলেই ডিম ফুটে মশার ছানা বের হয়। এসময়ে এদের দেখলে কেউই মনে করতে পারে না যে, এরাই কালে মশা হয়ে মানুষ খেতে আসবে। তোমরা নিশ্চয়ই গরমের দিনে স্থির জলে মশার ছানাদের তিড়িং তিড়িং করে নাচতে দেখেছ; কিন্তু তাদের চিনতে পারনি। ডিম থেকে বের হয়ে এরা জলে খেলা করতে থাকে। ঝি অনেক সময় না দেখে খাবার জলের সঙ্গে গেলাসে করে যে কতগুলি পোকা এনে দেয়, তা এই মশার ছানা। এদের নিশ্বাস ফেলবার যন্ত্র লেজের কাছে। নিশ্বাস ফেলবার সময় লেজের সামনের ভাগ জলের উপর ভাসিয়ে দিয়ে ঝুলতে থাকে। চোয়ালে একরকমের লোম আছে, সেই লোমগুলি কেমন করে যেন জলের উপর ছোট ছোট আবর্ত তৈরি করে। সেই আবর্তে ঘুরে নানারকমের খাবার দাবার এসে মুখের ভেতর পড়ে। মশার ছানা এমনি করেই জীবন কাটায়।

তিনবার চামড়া বদলের পর এরা আর-এক ধরনের আকার ধারণ করে, তাতে মশার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি মোটামুটি সবই বজায় থাকে। কিছুকাল পর পূর্ণাঙ্গ মশা এর ভেতর থেকে বের হয়। খোলসটা জলের উপর ভাসতে থাকে; মশা তারই উপর বসে ওড়ার জন্য যথেষ্ট বল লাভের অপেক্ষা করে। কিছুক্ষণ রোদ বাতাস লাগলেই তার হাত-পা শক্ত হয়। তখন সে শূন্যে উড়ে অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা করে।

মশাগুলো বড় লোভী। গায়ে বসামাত্রই যদি তাকে তাড়িয়ে না দাও, তবে সে আস্তে আস্তে শুঁড়টি চামড়ার ভেতর ঢুকিয়ে দেবে। রক্ত খেতে সে এতই আরাম পায় যে, শেষে আর তার বাহ্যজ্ঞান থাকে না। যখন গায়ে বসে, তখন দেখবে যে, তাঁর শরীরটা ছুঁচের সামনের ভাগের মতো সরু। খিদেয় তার এই দশা হয়েছে; কিন্তু কিছুক্ষণ তাকে খেতে দাও, দেখবে খুব তাড়াতাড়ি সে ফুলে উঠবে, তার পেটটি লাল হয়েছে; কিন্তু কিছুক্ষণ তাকে খেতে দাও, দেখবে খুব তাড়াতাড়ি সে ফুলে উঠবে, তার পেটটি লাল হয়ে আসবে। এসময়ে তার দুপাশে আঙুল দিয়ে চেপে সেই জায়গার চামড়া টান করে ধরলেই সে আটকে পড়ে। শুঁড়টি ঢুকাবার জন্য যে ফুটো করতে হয়েছিল, টান করে ধরলে সেই ফুটো সরু হয়ে যায়। সুতরাং শুঁড় আর বের হতে পারে না। রাতে মশারির ভেতরে দু-একটা মশা জোগাড়যন্ত্র করে প্রায়ই ঢুকে যায়। সকালবেলা আর তারা উদর নিয়ে চলতে পারে না। এমন অবস্থায় অনেক মশাকে ধরে টিপে মারা গেছে।

একটা গল্প বলে শেষ করছি। গল্পটা বোধ হয় সত্যি নয় কিন্তু এতে মজা আছে। বেশ ক'জন আইরিস সাহেব একবার এদেশে এসেছিলেন। তারা কখনো মশা দেখেননি, সুতরাং প্রথমে মশারি কেনেননি। রাতে শুয়েই বুঝতে পারলেন যে, এদেশের কাণ্ডকারখানা অন্যরকম। অনেক ধমকালেন, অনেকবার হাত মুঠো করে ভয় দেখালেন, দাঁত খিঁচোলেন, কিন্তু মশারা কোনোমতেই ভয় পেল না। অবশেষে লেপ দিয়ে সারা শরীর ঢেকে কিছুক্ষণের জন্য নিরাপদ হলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন লেপের এক কোণ সরিয়ে দেখলেন যে, ঘরের ভেতর একটা জোনাকি পোকা এসেছে। দেখেই তিনি চ্যাঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরে আর রক্ষা নেই। লেপ মুড়ি দিয়ে কি করবে? ওই দেখ, মশাগুলো একটা লণ্ঠন নিয়ে আমাদের খুঁজতে বের হয়েছে!'

—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ভারতের পথে পথে

পটচিত্রের গ্রাম পিংলা

বাংলার পটচিত্রের খ্যাতি এখন বিশ্বজুড়ে। আর সেই খ্যাতি এনে দিয়েছে মেদিনীপুরের পিংলা গ্রাম। সেখানকার পটুয়া পরিবারগুলি বংশপরম্পরায় পটচিত্র তৈরি করেন। প্রাকৃতিক গাছ-গাছড়া দিয়ে রঙ তৈরি করে ছবি আঁকেন তারা। মনসামঙ্গল, পুরাণের নানা কাহিনি ফুটে ওটে ওঠে সেই ছবিতে। এক সময় পটুয়ারা ছবি একে সেই বিষয়ে গান বেঁধে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। এখন সময় পাল্টেছে তাই তাঁরা এখন শুধু ছবি আঁকেন; গান বাঁধে না। তাঁদের ছবি এখন বিদেশেও পাড়ি দেয়। পটুয়া পরিবারের ছেলে-মেয়েরা বাইরে আলাদা করে কখনো ছবি আঁকা শেখে না। দেখে দেখেই শিখে ফেলে। তবে অনেকে ভাবনায় আছে প্রাকৃতিক সেই রঙের জায়গায় যাতে জায়গা করে না নেয় কেমিক্যাল রঙ।

এসো সংস্কৃত শিখি

इदानीम् आगन्तुं न शक्यते।

এখন আসতে পারা যাবে না।

भवान् अपि अङ्गीकरोति किम्?

তুমিও কি স্বীকার করছ?

किं भवान् अपि विश्वसितवान्?

কি, তুমিও বিশ্বাস করলে?

सः विश्वासयोग्यः किम्?

তিনি বিশ্বাসযোগ্য কি?

किम्, किञ्चित् साहाय्यं करोति?

কি, একটু সহায়তা করবে?

ভালো কথা

ক্ষতিকর বাজি না ফাটানো

কালীপূজার রাত্রে আমরা কয়েকজন বন্ধু আমাদের ছাতে বাজি ফাটাবো ঠিক করেছিলাম। সেইমতো সন্ধ্যায় অপু, তপু, তাতাই ও দীপ এসে পড়লো। আমরা ছাতে গেলাম। তাতাই এক ব্যাগ বাজি এনেছে। অপু, তপু ও দীপও এনেছে। তাতাই প্রথমে একটা চকোলেট বোম ফাটালো। ওহ্ কী শব্দ, যেন কানে তালা লেগে যায়! আবার একটায় যখন আগুন ধরাতে যাবে তখনই আমার ঠাকুমা এসে হাজির। বললেন বাজি ফাটাস পরে, আগে একটা গল্প শোন। ঠাকুমা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন চকোলেট বোম ফাটালে শুধু শব্দ দূষণ বা পরিবেশ দূষণ হয় না; বয়স্ক, শিশু ও রোগীদের খুব ক্ষতি কীভাবে হতে পারে। ঠাকুমার কথা শুনে আমরা ঠিক করলাম আর কোনোদিন বাজি ফাটাবো না।

সাগ্নিক দাস, নবম শ্রেণী, সিঙ্গাতলা, মালদা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) র হ বা রি

(২) তি ভা স মি

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) র হা পা বা তা

(২) ড় পো কা মা ক

৬ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) শান্তিনিকেতন (২) হংসবলাকা

৬ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) গিরিপথ (২) দেশভক্ত

উত্তরদাতার নাম

(১) সায়ণ ঘোষ, গাজেলা, মালদা। (২) ঋতম হালদার, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।
(৩) আলাপন দলুই, হলদিয়া, পূ: মেদিনীপুর। (৪) মৌসুমী সরদার, জয়নগর, দ: ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

SURYA ROSHNI LTD & SURYA FOUNDATION

Tel. : 011-25262994, 25253681   Website : www.suryafoundation.net.in

Surya Foundation is a renowned organisation for imparting training to the youth for their all-round development. We require dedicated & diligent youth brought up in sound **SANGH** culture with impeccable character and interested in social and professional work for entry in **SURYA ROSHNI LTD** and **SURYA FOUNDATION** in the following categories. Candidates will be put through an interview process prior to their selection.

Posting will be given after successful completion of initial training at Surya Training Campus and one year On Job Training (OJT).

1. **CA, Engineers, MBA, MCA, M.Sc.**
   - (a) **CA** - Freshers and 5 to 15 years experienced
   - (b) **IPCC / Intermediate**
   - (c) **Engineers** - Freshers as well as experienced B.Tech (IIT), B.Tech (NIT) and M.Tech & B.Tech. from other Institutes.
   - (d) **MBA (IIM) and MBA (other institutes)**
2. **MCA, MSc, M.Com, B.Ed, MSW, M.A., M.Ed** - Freshers as well as experienced
3. **Graduates**
   - (a) Graduates in Mass Communication (Media)
   - (b) B.Com. with three years experience in Accounts, Purchase and Stores.
   - (c) B.Sc., BCA, BBA, BA and B.Com. (Passed or Persuing)

Note : Salary based on qualifications & Experience.

Application Form

Apply on a separate sheet of paper)

Affix latest Photograph here

Category 1 / 2 / 3 (Indicate the category applied for)

Full Name (In Capital) __________ Date of Birth _________ Caste _______ Married / Single _______

Father's Name __________________________ Father's Occupation ________ Monthly Salary _____

Brothers (Excluding Self) _______ Sisters ________________

Educational Qualification_______________________________ (Attach Photocopy of Marksheet)

Have you attended NCC/NSS/OTC/ITC/Sheet Shivir? Give Details of location of Camp and dates __________________

Were you associated with Seva Bharati / Vidya Bharati / Vanvasi Kalyan Ashram / Any other Sangh Project? Give details.

Is anyone known to you in Surya Family? Give his name and department _____________________________________

Have you ever been Interviewed in Surya Foundation? If yes, give Year and Cadre for which Interviewed. ____________

Address for Correspondence _________ Pincode ______ Phone No. __________ Mobile __________ Email ________

Give details of any special achievements, qualifications etc.

Apply with detailed biodata at the following address. Applicants for 'Category 1 to 3' should also send their detailed CV along with the application or Email : **suryainterview@gmail.com.**

Surya Foundation : B-3/330, Paschim Vihar, New Delhi - 110063

Apply within two months of the publication of the advertisement

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
20 November - 2017 - Rs. 10.00,

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা।।